

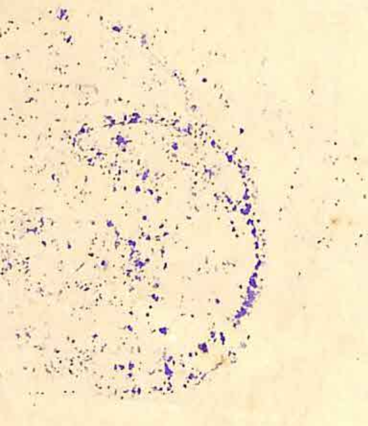
আমার ভালুক শিকার

শিবরাম চক্রবর্তী

শিবরাম চক্রবর্তী



আমার
ভালুক
শিকার



আমার ভালুক শিকার

শিবরাম চক্রবর্তী

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
॥ অক্টোবর ১৯৫৮ ॥

॥ প্রচ্ছদ ॥
সত্যসেবক মুখোপাধ্যায়

॥ চিত্রসজ্জা ॥
শৈল চক্রবর্তী

মূল্য ঃ দুই টাকা পঞ্চাশ ন. প.

শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

গল্পসূচী

আমার ভালুক শিকার

তোমরা আমাকে গল্প লেখক বলেই জানো। কিন্তু আমি যে একজন ভালো শিকারী, এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। আমি নিজেই একথা জানতাম না, শিকার করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত!

(আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কোথায় কোথায় না কি দশ-বারো বছরের ছেলেরা, দশ-বারো হাত বাঘ শিকার করে ফেলেছে। আজকের ৭ই জুলাইয়ের খবরের কাগজেই তোমরা দেখবে, একটা সাত বছরের ছেলে ন' ফিট বাঘ সাবাড় করে দিয়েছে। বাঘটার উপদ্রবে গ্রামশুদ্ধ লোকে ভীত সন্ত্রস্ত। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। ভাগ্যিস সেখানকার তালুকদারের একটা ছেলে ছিল এবং আরো সৌভাগ্যের কথা যে তার বয়স ছিল মোটে বছর সাত, তাই গ্রামবাসীদের বাঘের কবল থেকে এত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হল।

তোমরা হয়তো বলবে যে, ছেলেটার ওজনের চেয়ে বন্দুকের ওজনই যে ভারি। তা হতে পারে, তবু একথা আমি অবিশ্বাস করি না, বিশেষ করে যখন খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নিজের চোখে দেখেছি। আমার ভালুক শিকারের খবরটাও কাগজেই দেখেছিলাম— তারপর থেকেই তো ঘটনাটায় আমার দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে। প্রথমে আমি ধারণা করতেই পারিনি যে আমিই ভালুকটাকে মেরেছি,



আমিও দৌড়চ্ছি, ভালুকও দৌড়চ্ছে।

পৃষ্ঠা ৯

এবং ভালুকটারও মনে যেন সেই সন্দেহ বরাবর ছিল মনে হয়, মরার আগে পর্যন্ত। কিন্তু যখন খবরের কাগজে আমার শিকার-কাহিনী নিজে পড়লাম, তখন নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা আমার দূর হল। ভালুকটার সন্দেহ বোধ করি শেষ অবধি থেকেই গেছল, কেন না খবরের কাগজটা চোখে দেখার পর্যন্ত তার সুযোগ হয়নি— কিন্তু না হোক, সে নিজেই দূর হয়ে গেছে।)

সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটা এবার তোমাদের বলি—আমার মাসতুতো বড়দা সুন্দরবনের দিকে অনেক জমি-টমি নিয়ে চাষ-বাস শুরু করেছেন। সেদিন তাঁর চিঠি পেলাম—এবার গ্রীষ্মটা এ-ধারেই কাটিয়ে যাও না, নতুন জীবনের আস্বাদ পাবে, অভিজ্ঞতাও বেড়ে যাবে অনেক। সঙ্গে করে কিছুই আনতে হবে না, কেবল কয়েক জোড়া কাপড় এনো।

আমি লিখলাম—যেতে লিখেছ যাব না-হয়। কিন্তু কাপড় নিয়ে যেতে হবে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার সুটকেসে তো দুখানার বেশী ধরবে না, এবং বাড়তি বোঝা বইতে আমি নারাজ। আর তাছাড়া, এই সেদিনই তো তুমি কলকাতা থেকে বারো জোড়া কাপড় নিয়ে গেছ! অত কাপড় সেখানে কি কর? বৌদি নিশ্চয়ই ধুতি পরা ধরেননি। তোমার কাপড়েই আমার চলে যাবে—তুমি তো একলা মানুষ, বাপু!

দাদা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—আর কিছু না, বাঘের জন্য।

আমার সবিস্মিত পালটা জবাব গেল—সে কি! বাঘে ছাগল গরুই চুরি করে শুনেছি, আজকাল কাপড়-চোপড়ও সরাচ্ছে না কি? কাপড়-চোপড়ের ব্যবহার যখন শিখেছে, তখন তারা রীতিমতো সভ্য হয়েছে বলতে হবে।

দাদা উত্তর দিলেন—চিঠিতে অত বকতে পারি না। আমার এখানে এসে তোমার কাপড়ের অভাব হবে না, একথা নিশ্চয়ই—কিন্তু যে-কাপড় তোমাকে আনতে বলেছি, তার দরকার পথেই। চিড়িয়াখানার বাঘই দেখেছ, আসল বাঘ তো কোনো দিন দেখনি, আসল বাঘের হুহুঙ্কারও শোননি। চিড়িয়াখানার ওগুলোকে বেড়াল বলতে পার। সুন্দরবন দিয়ে স্টিমারে আসতে দু পাশের জঙ্গলে বাঘের হুঙ্কার শোনা যায়, শোনামাত্রই কাপড় বদলানোর প্রয়োজন অনুভব করবে। প্রায় সকলেই সেটা করে থাকেন। যত ঘন ঘন ডাকবে (ডাকাটা অবশ্য তাদের খেয়ালের উপর নির্ভর করে) তত ঘন ঘনই কাপড়ের প্রয়োজন। তবে তুমি যদি খাকী প্যাণ্ট পরে আস, তাহলে দরকার হবে না।

অতঃপর, চব্বিশ জোড়া কাপড় কিনে নিয়ে আমি সুন্দরবন গমন করলাম।

আমার, মাসতুতো দাদাও একজন বড় শিকারী। এ তথ্যটা আগে জানতাম না, এবার গিয়ে জানলাম। শুধু হাতেই অনেক দুর্ধর্ষ বাঘকে তিনি পট্‌কে ফেলেছেন। বন্দুক নিয়েও শিকারের অভ্যাস তাঁর আছে, কিন্তু সেরকম সুযোগে তিনি বন্দুককে লাঠির মতো ব্যবহার করতেই ভালোবাসেন। তাঁর মতে কেঁদো বাঘকে কাঁদাতে হলে বন্দুকের কুঁদোই প্রশস্ত—গুলি করা কোনো কাজের কথাই নয়। কিছুদিন আগে এক বাঘের সঙ্গে তাঁর বড় হাতাহাতি হয়ে গেছল, তাঁর নিজের মুখেই আমার শোনা। বাঘটার অত্যাচার বেজায় বেড়ে গেছল, সমস্ত গ্রামটার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতো ব্যাটা, এমন কি তাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে হানা দিত পর্যন্ত।

দাদার নিজের ভাষাতেই বলি—তারপর তো ভাই বেরুলাম

বন্দুক নিয়ে। কি করি, সমস্ত গ্রামের অনুরোধ। ঠেলা তো যায় না, একাই গেলাম। সঙ্গে লোকজন নিয়ে শিকারে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। একবার অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে যা বিপদে পড়েছিলাম, কি বলব! বাঘ করল তাদের তাড়া, তারা এসে পড়ল আমার ঘাড়ে, মানুষের তাড়ায় প্রাণে মারা যাই আর কি! গেলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি সম্মুখে বাঘ, বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে জানলাম টোটা আনা হয়নি—আর সে বন্দুকটা এমন ভারি যে, তাকে লাঠির মতোও খেলানো যায় না। কি করি, বন্দুক ফেলে দিয়ে শুধু হাতেই বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোর ধস্তাধস্তি, কখনো বাঘ উপরে আমি নীচে, কখনো আমি নীচে বাঘ উপরে—বাঘটাকে প্রায় কাবু করে এনেছি, এমন সময়ে—

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি, বৌদি বাধা দিয়ে বললেন, এমন সময়ে তোমার দাদা গেলেন তক্তপোশ থেকে পড়ে। জলের ছাঁট দিয়ে, হাওয়া করে, অনেক কষ্টে ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। মাথাটা গেল কেটে, তিনদিন জলপটি দিতে হয়েছিল।

এরপর দাদা বারো দিন আর বৌদির সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না এবং মাছের মুড়ো সব আমার পাতেই পড়তে লাগল।

দাদা একদিন চুপি চুপি আমায় বললেন, তোমার বৌদির কীর্তি জানো না তো! খুকীকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে জাম কুড়োতে গিয়ে, পড়েছিলেন এক ভালুকের পাল্লায়। খুকী তো পালিয়ে এল, উনি ভয়ে জবু-থবু হয়ে, একটা উইয়ের ঢিপির উপর বসে পড়ে এমন চ্যাচামেচি আর কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন যে, ভালুকটা ওঁর ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।

আমি বললাম, ওঁর ভাষা না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছল, এমনো তো হতে পারে !

দাদা বিরক্তি প্রকাশ করলেন—হ্যাঃ ! ভারি তো ভাষা ! প্রত্যেক চিঠিতে দুশো করে বানান ভুল !

বৌদির পক্ষ সমর্থন করতে আমাকে, অন্তত মাছের মুড়োর কৃতজ্ঞতা-সূত্রেও, বলতে হল, ভালুকরা শুনেছি সাইলেণ্ট ওয়ার্কার, বক্তৃতা-টক্তৃতা ওরা বড় পছন্দ করে না। কাজেই বৌদি ভালুক তাড়াবার ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন, বুঝলে দাদা ?

দাদা কোনো জবাব দিলেন না, আপন মনে গজরাতে লাগলেন। বৌদির তরফে আমার ওকালতি শুনে তিনি মুষড়ে পড়লেন, কি ক্ষেপে গেলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সেদিন বিকেলেই তাঁর মনোভাব টের পাওয়া গেল। দাদা আমাকে হুকুম করলেন, পাশের জঙ্গল থেকে এক ঝুড়ি জাম কুড়িয়ে আনতে—সেই জঙ্গল, যেখানে বৌদির সঙ্গে ভালুকের প্রথম দর্শন হয়েছিল।

দাদার গরহজম হয়েছিল, তাই জাম খাওয়া দরকার, কিন্তু আমি দাদার ডিপ্লোমাসি বুজতে পারলাম। আমাকে ভালুকের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আমাকে সুদ্ধ বিনা আয়াসে হজম করার মতলব। বুঝলাম বৌদির পক্ষে যাওয়া আমার ভালো হয়নি। আমতা আমতা করছি দেখে দাদা বললেন, আমার বন্দুকটা না হয় নিয়ে যা, কিন্তু দেখিস, ভুলে ফেলে আসিস না যেন।

ওঃ, কি কূটচক্রী আমার মাসতুতো বড়দা ! ভালুকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা বরং আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বন্দুক ছোঁড়া—? একলা থাকলে হয়তো দৌড়ে পালিয়ে আসতে পারব, কিন্তু ঐ ভারি বন্দুকের হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে দৌড়তে হলে, সেই রেসে

ভালুকই যে প্রথম হবে এ বিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ ছিল না, দেখলাম দাদাও তেমনি স্থির-নিশ্চয়।

দাদা জামের ঝুড়ি আর বন্দুকটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন, চট্ করে যা, দেরি করিসনি। তোর ভয় করছে না কি ?

অগত্যা আমায় বেরুতে হল। বেশ দেখতে পেলাম, আমার মাসতুতো বড়দা আড়ালে একটু মুচকি হেসে নিলেন। মাছের মুড়োর বিরহ তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। আঃ, এই বিদেশে-বিভুঁয়ে মাসতুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে ভালো করিনি। খতিয়ে দেখলাম, ওই চব্বিশ জোড়া কাপড়ই বড়দার নেট লাভ।

বেরিয়ে পড়লাম। এক হাতে ঝুড়ি, আরেক হাতে বন্দুক। নিশ্চয়ই আমাকে খুব বীরের মতো দেখাচ্ছিল। যদিও একটু বিশ্রী রকমের ভারি, তবু বন্দুকে আমায় বেশ মানায়। ক্রমশ মনে সাহস এল—আসুক না ব্যাটা ভালুক, তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বড়দাকেও! মাসতুতো ভাই কেবল চোরে-চোরেই হয় না, শিকারীতে-শিকারীতেও হতে পারে! উনিই একজন বড় শিকারী, আর আমি বুঝি কিছু না ?

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। আসুক না ব্যাটা ভালুক এইবার! ঝুড়িটা হাতে নেওয়ায় যতটা মনুষ্যত্বের মর্যাদা লাঘব হয়েছিল, বন্দুকে তার ঢের বেশী পুষিয়ে গেছে। আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক বীরের মতো। অথচ দুঃখের বিষয়, এই জঙ্গল-পথে একজনও দেখবার লোক নেই। এ সময়ে একটা ভালুককে দর্শকের মধ্যে পেলেও আমি পুলকিত হতাম।

বন্দুক কখনো যে ছুঁড়িনি তা নয়। আমার এক বন্ধুর একটা ভালো বন্দুক ছিল, হরিণ-শিকারের উচ্চাভিলাষ-বশে তিনি ওটা কিনেছিলেন। বহুদিনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি গাছ-শিকার

করতে পারতেন। তিনি বলতেন—গাছ-শিকারের অনেক সুবিধে, প্রথমত, গাছেরা হরিণের মতো অত দৌড়য় না, এমন কি ছুটে পালাবার বদভ্যাসই নেই ওদের, দ্বিতীয়ত,—ইত্যাদি, সে বিস্তর কথা। তা, তিনি সত্যিই গাছ-শিকার করতে পারতেন—অন্তত বাতাস একটু জোর না বইলে, উপযুক্ত আবহাওয়ায় এবং গাছটাও হাতের কাছে হলে, তিনি অনায়াসে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন—প্রায় প্রত্যেক বারই।

আমিও তাঁর সঙ্গে গাছ-শিকার করেছি, তবে যে-কোনো গাছ আমি পারতাম না। আকারে-প্রকারে কিছু বড় হলেই আমার পক্ষে সুবিধা হত, গুঁড়ির দিকটাতেই আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। বৃক্ষ-শিকারে যখন এতদিন হাত পাকিয়েছি, তখন ঋক্ষ-শিকারে যে একেবারে বেহাত হব না, এ ভরসা আমার ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে দেখি পাকা-পাকা জামে গাছ ভর্তি! জাম দেখে জাম্বুবানের কথা আমি ভুলেই গেলাম। এমন বড় বড় পাকা-পাকা খাসা জাম! জিভ লালায়িত হয়ে উঠল। বন্দুকটা একটা গাছে ঠেসিয়ে, দু হাতে ঝুড়ি ভরতে লাগলাম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না, একটা খস খস শব্দে আমার চমক ভাঙল। চেয়ে দেখি—ভালুক!

ভালুকটা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমি যা করছি, সেও তাতেই ব্যাপৃত। একহাত দিয়ে জামের একটা নীচু ডালকে সে বাগিয়ে ধরেছে, অন্য হাতে নির্বিচারে মুখে পুরছে—কাঁচা ডাঁশা সমস্ত। আমি বিস্মিত হলাম বললে বেশী বলা হয় না! বোধ হয়, আমি ঈষৎ ভীতই হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, ভালুক-দর্শনের বাঞ্ছা একটু আগেই করেছি বটে, কিন্তু দেখা না পেলেই যেন আমি বেশী আশ্বস্ত হতাম। ঠিক সেই মারাত্মক মুহূর্তেই আমাদের চারি চক্ষুর মিলন!

আমাকে দেখেই ভালুকটা জাম খাওয়া স্থগিত রাখল এবং বেশ একটু পুলকিত-বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। গাছে উঠতে পারলে বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে, কিন্তু ভালুকের হাতে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ভালুকরা গাছে উঠতেও ওস্তাদ।

অগত্যা শ্রেষ্ঠ উপায়—পালিয়ে বাঁচা। বন্দুক ফেলে যেতে দাদার নিষেধ, বন্দুকটা বগল-দাবাই করে চোঁ চা দৌড় দেবার মতলব করেছি, দেখলাম সেও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি দৌড়লেই সে যে আমার পিছু নিতে দ্বিধা বোধ করবে না, আমি তা বেশ বুঝতে পারলাম। ভালুকজাতির ব্যবহার, আমার মোটেই ভালো লাগল না।

আমিও দৌড়চ্ছি, ভালুকও দৌড়চ্ছে। বন্দুকের বোঝা নিয়ে ভালুক-দৌড়ে আমি সুবিধা করতে পারব না বুঝতে পারলাম। যদি এখনো বন্দুকটা না ফেলে দিই, তাহলে নিজেকেই এখানে ফেলে যেতে হবে। অগত্যা অনেক বিবেচনা করে বন্দুককেই বিসর্জন দিলাম।

কিছুদূর দৌড়ে ভালুকের পদশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, সে আমার বন্দুকটা নিয়ে পড়েছে। ওটাকে নতুন রকমের কোনো খাদ্য মনে করেছে কি না, ওই জানে! আমিও স্তব্ধ হয়ে ওর কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিলাম।

ভালুকটা বেশ বুদ্ধিমান। অল্পক্ষণেই সে বুঝতে পারল ওটা খাদ্য নয়, হাতে নিয়ে দৌড়বার জিনিস। এবার বন্দুকটা হস্তগত করে সে আমাকে তাড়া করল। বিপদের উপর বিপদ—এবার আমার বিপক্ষে ভালুক এবং বন্দুক। ভালুকটা কি রকম শিকারী আমার জানা ছিল না। বন্দুকে ওর হাত অন্তত আমার চেয়ে খারাপ নয় বলেই আমার আন্দাজ।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। কয়েক লাফ না যেতেই পেছনে বন্দুকের আওয়াজ। আমি চোখ কান বুঁজে সটান শুয়ে পড়লাম,—যাতে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়—যুদ্ধের তাই রীতি কি না! তারপর আবার হুড়ুম! আবার, আবার সেই বন্দুক-গর্জন! আমি দুরু দুরু বক্ষে শুয়ে শুয়ে দুর্গানাম করতে লাগলাম। ভালুক শিকার করতে এসে ভালুকের হাতে না 'শিকৃত' হয়ে যাই!

আমি চোখ বুজেও যেন স্পষ্ট দেখছিলাম, ভালুকটা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তার গুলিতে আমি হতাহত—অন্তত একটা কিছু যে হয়েছি, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। গুলির আঘাতে না যাই, ভালুকের আঘাতে এবার গেলাম! মৃত্যুর পূর্বক্ষণে জীবনের সমস্ত ঘটনা, বায়স্কোপের ফিল্‌মের মতো, মনশ্চক্ষের উপর দিয়ে চলে যায় বলে একটা গুজব শোনা ছিল। সত্যিই তাই—একেবারে হুবহু। ছোটবেলার পাঠশালা পালিয়ে আম্র-শিকার থেকে শুরু করে আজকের ভালুক শিকার পর্যন্ত—প্রায় চারশো পাতার একটা মোটা সচিত্র জীবন-স্মৃতি আমার মনে মনে ভাবা, লেখা, ছাপানো, প্রুফ কারেক্ট করা—এমন কি তার পাঁচ হাজার কপি বিক্রি অবধি শেষ হয়ে গেল।

জীবন-স্মৃতি রচনার পর আত্মীয় স্বজনের কথা আমার স্মরণে এল। পরিবার আমার খুব সামান্যই—একমাত্র মা এবং একমাত্র ভাই—সুতরাং সে-দুশ্চিন্তা সমাধা করাও খুব কঠিন হল না। এক সেকেণ্ড—দু সেকেণ্ড—তিন—চার—পাঁচ সেকেণ্ড—এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু ভালুক বেটা এখনো এসে পৌঁছল না তো! কি হল তার? এতটা দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে না কি?

ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখি, ওমা, সেও যে সটান চিতপাত! সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম—এ ভালুকটা তো ভারি অনুকরণপ্রিয় দেখছি!

কিন্তু নড়ে না চড়ে না যে! কাছে গিয়ে দেখলাম, নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা গেছে বেচারা! বুঝলাম, অত্যন্ত মনক্ষোভেই এই অন্যায়টা সে করেছে! প্রথম দিন বৌদির ব্যবহারে সে লজ্জা পেয়েছিল, আজ আমার কাপুরুষতার পরিচয়ে সে এতটা মর্মাহত হয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

বন্দুক হাতে সগর্বে বাড়ি ফিরলাম। আমার জাম-হীনতা লক্ষ্য করে দাদার অসন্তোষ প্রকাশের পূর্বেই ঘোষণা করে দিলাম—বৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভালুকটাকে আজ নিপাত করে এসেছি! কেবল দুটো শট—ব্যাস, খতম!

দাদা-বৌদি, এমন কি খুকী পর্যন্ত দেখতে ছুটল। আমিও চললাম—এবার আর বন্দুকটাকে সঙ্গে নিলাম না, পাঁচজনে যাত্রা নিষেধ, পাঁজিতে লেখে। দাদা বহু পরিশ্রমে ও বৌদির সাহায্যে, ভালুকের ল্যাজটাকে দেহচ্যুত করে, এই বৃহৎ শিকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, সযত্নে আহরণ করে নিয়ে এলেন। এই সহযোগিতার ফলে দাদা ও বৌদির মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেল। আপনি আত্মদান করে ভালুকটা দাদা ও বৌদির মধ্যে মিলন-গ্রন্থি রচনা করে গেল—তার এই অসাধারণ মহত্ত্বে সে নতুন মহিমা নিয়ে আমার কাছে প্রতিভাত হল। আমার রচনায় তাকে অমর করে রাখলাম, অন্তত আমার চেয়ে সে বেশীদিন টিকবে আশা করি।

বাড়ি ফিরেই দাদা বললেন, অমৃতবাজার পত্রিকায় খবরটা পাঠিয়ে দিই, কি বলিস? A big wild bear was heroically killed by my young brother aged—aged কত রে?

—আমার age তুমি তো জানোই!—আমি উত্তর দিলাম।

—উঁহু, কমিয়ে লিখতে হবে কি না! নইলে বাহাদুরি কিসের! দশ-বারো বছর কমিয়ে দিই, কি বলিস?

কিন্তু দশ-বারো বছর কমিয়েও আমার বয়স যখন দশ-বারো বছরের কাছাকাছি আনা গেল না (সাতে দাঁড় করানো তো দুঃসাধ্য ব্যাপার!)— তখন বাধ্য হয়ে 'Young' এই বিশেষণের উপর নির্ভর করে, আমার বয়সাল্পতাটা লোকের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল।

সেদিন আমার পাতে দু-দুটো মুড়ো পড়ল, খুকী মা'কে বলে রেখেছে তার মুড়োটা কাকামণিকে দিতে। আমি আপত্তি করলাম না, ভালুকের আত্মবিসর্জনে যখন করিনি, খুকীর মুড়ো বিসর্জনেই বা করব কেন? সব চেয়ে আশ্চর্য এই, আমার ঝোলের বাটির অস্বাভাবিক উচ্চতা দেখেও দাদা আজ ভ্রূক্ষেপ করলেন না!

কাষ্ঠ-কাশির চিকিৎসা

বড়দির আদুরে খোকাকে একটি কথা বলার কারু জো নেই। বলেছ কি, খোকা তো বাড়ি মাথায় করেছেই, বড়দি আবার পাড়া মাথায় করেন! প্রতিবেশীদের প্রতি বেশী রাগ আমার নেই—তাই যতদূর সম্ভব বিবেচনা করে বড়দি আর খোকাকে না ঘাঁটিয়েই আমি চলি।

কালই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে কিনে এনেছি, আজ সকালেই দেখি খোকা সেই দামী পাইনের ছড়িটা হস্তগত করে অম্লান বদনে চর্বণ করছে। খোকার এইভাবে ছড়িটি আত্মসাৎ করবার প্রয়াস আমার একেবারেই ভালো লাগল না, ইচ্ছা হল ওকে বুঝিয়ে দিই ছড়ির আস্বাদ মুখে নয়, পিঠে। কিন্তু ভয়ানকভাবে আত্মসংবরণ করে ফেললাম।

ভয়ে ভয়ে বড়দির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—দেখছ, খোকা কি করছে?

সঙ্গে সঙ্গে বড়দির খাণ্ডামার্ক জবাব—কি তোমার পাকা ধানে মই দিচ্ছে? ও তো ছড়ি চিবুচ্চে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, তা চিবুক ক্ষতি নেই, কিন্তু যত রকমের কাঠ আছে, তার মধ্যে পাইন কাঠ খাদ্য হিসেবে সব চেয়ে কম পুষ্টিকর, তা জানো কি? তাছাড়া এখন চারধারে যে রকম হুপিংকাফ হচ্ছে—



...দেখি খোকা সেই দামী পাইনের ছড়িটা......চর্বণ করছে। পৃষ্ঠা ১৩

বড়দি ঝামটা দিয়ে উঠলেন—যাও যাও, তোমাকে আর বোকা বুঝাতে হবে না। সেদিন আমি একটা ওষুধের বিজ্ঞাপনে পড়লাম পাইন গাছের হাওয়ায় যক্ষ্মাকাশি পর্যন্ত সারে—যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায়, তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে? পাগল!

আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, বললাম—বেশ, আমার কথার চেয়ে বিজ্ঞাপনেই যখন তোমার বেশী বিশ্বাস তখন আজই আমি এক ডজন ছড়ির অর্ডার দিচ্ছি, তুমি রোজ একটা করে খোকাকে খাওয়াও। আহার ওষুধ দুই হবে। বলেই বিনা-ছড়ি হাতেই বেরিয়ে পড়লাম।

জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হতে লাগল। সমস্ত দিন আর বাড়ি ফিরলাম না। ওয়াই. এম. সি. এ-তে সকালের লাঞ্চ সারলাম, তারপর সোজা কলেজে গেলাম, সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়ি বিকেলের জলযোগ পর্ব সেরে চলে গেলাম খেলার মাঠে। মহমেডান স্পোর্টিং জেতায় যে স্ফূর্তিটা হল, ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টা দুই ব্রিজ খেলায় হেরে গিয়ে সেটা নষ্ট করলাম। সেখান থেকে গেলাম সিনেমায় সাড়ে নটার শোয়ে।

রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে সদর দরজা খোলাই পেলাম। ডাকা-হাঁকি করতে হল না, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। জ্যাঠামশাই ভারি বদরাগী মানুষ, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হলে আর রক্ষা নেই। পা টিপে টিপে নিজের ঘরের অভিমুখে যাচ্ছি, বড়দি কোথায় ওত পেতে ছিলেন জানি না, অকস্মাৎ এসে আক্রমণ করলেন।

—সুহৃৎ, খোকা বুঝি আর বাঁচে না!

বড়দির অতর্কিত আক্রমণ, তার পরেই এই দারুণ দুঃসংবাদ—আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। —কেন, কেন, কি হয়েছে? ছড়িটা গিলে ফেলেছে না কি?

বিপদের মুহূর্তে সব চেয়ে প্রিয় জিনিসের কথাই আগে মনে পড়ে। ছড়িটার দুর্ঘটনা আশঙ্কা করলাম।

—না না, ছড়ির কিছু হয়নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে বড়দির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম —যাক, ছড়ির কোনো অঙ্গহানি হয়নি তো! বাঁচা গেছে।

—না, ছড়ির কিছু হয়নি, তবে সন্ধ্যে থেকে খোকা ভারি কাশছে —ভয়ানক কাশছে। হুপিংকাফ হয়েছে ওর—নিশ্চয়ই হুপিংকাফ। কি হবে সুহৃৎ?

এতক্ষণে মুরুব্বি চাল দেবার সুযোগ এসেছে আমার। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললাম, তখনই তো বলেছিলাম সকালে। তা তুমি গ্রাহ্যই করলে না। তখন পাইনের হাওয়ায় কত কি উপকারিতার কথা আমায় শুনিয়ে দিলে! এখন ঠেলা সামলাও।

—না সুহৃৎ, তোমাকে একবার ডাক্তার-বাড়ি যেতে হবে এখুনি।

—এত রাত্রে? অসম্ভব, ডাক্তার কি আর জেগে আছে এখনো? তার চেয়ে এক কাজ কর না বড়দি?

ব্যগ্রভাবে বড়দি প্রশ্ন করলেন, কি, কি?

—পাইনের হাওয়ায় যক্ষ্মা সারে, আর হুপিং সারবে না? ছড়িটা দিয়ে খোকাকে হাওয়া কর না কেন?

বড়দি রোষ-কষায়িত নেত্রে আমার দিকে দৃক্‌পাত করলেন—না তোমাকে যেতেই হবে ডাক্তারের কাছে। নইলে জ্যাঠামশাইকে জাগিয়ে দেব। এই ডাক ছাড়লাম—ছাড়ি?

—না না, রক্ষে কর—দোহাই। যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে।

খোকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলাম। হ্যাঁ, হুপিংকাফ, নিশ্চয়ই তাই, ছড়ি খেলে হুপিংকাফ হবে, জানা কথা। কি কাশিটাই না

কাশছে, নিজের নাক-ডাকার আওয়াজে শুনতে পাচ্ছেন না তাই, নইলে এই কাশির ধ্বনি কানে গেলে জ্যাঠামশাই ক্ষেপে যেতেন।

গেলাম ডাক্তারের কাছে—ভাগ্যক্রমে দেখাও হল। কাল সকালে তিনি খোকাকে দেখতে আসবেন। এখন এক বোতল পেটেন্ট হুপিংকাফ-কিওর দিলেন, ব্যবস্থাও বাতলে দিলেন। বড়দিকে বললাম, এই ওষুধটা এক এক চামচ তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাওয়াতে হবে।

—তিন ঘণ্টা বাদ বাদ? ওতে কি হয়? অসুখটা কতখানি বেড়েছে দেখছ না? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ালে যদি বাঁচে খোকা?

—বেশ, তাই খাওয়াও। আমি এখন ঘুমুতে চললাম।

ঘণ্টাখানেক চোখ বুজেছি কি না সন্দেহ, বড়দির ধাক্কায় জেগে উঠলাম। —আঃ, কি ঘুমুচ্ছিস মোষের মতো? এদিকে খোকার যে নাড়ি ছাড়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠলাম—তাই না কি? যতটুকু নাড়ি জ্ঞান তাই ফলিয়েই বুঝলাম নাড়ি বেশ টন টন করছে। বড়দিকে সে-কথা জানাতেই তিনি আগুন হয়ে উঠলেন, জ্যাঠামশায়ের ভয়ে চ্যাচাতে পারলেন না এই যা রক্ষা। জিজ্ঞাসা করলাম, ওষুধ খাইয়েছ?

—হ্যাঁ, দু চামচ।

—এক ঘণ্টায় দু চামচ? বেশ করেছ!

—সুহৃৎ, খোকার বুকে সেই পুলটিসটা দিলে কেমন হয়? অ্যান্টিফ্লুজিস্টিন—যেটা জ্যাঠামশায়ের নিউমোনিয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল—এখনো তো এক কৌটো রয়েছে। দেব সেটা

আমি বললাম, ডাক্তার তো পুলটিস দিতে বলেনি!

বড়দি বলেলন, ডাক্তার তো সব জানে। সেটা দিয়ে কিন্তু

জ্যাঠামশায়ের খুব উপকার হয়েছিল, আমি নিজে দেখেছি। তুই স্টোভ জ্বাল, আমি ফ্লানেল যোগাড় করি।

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বড়দি অনুচ্চ চীৎকারের একটা নমুনার দ্বারা জানিয়ে দিলেন, স্টোভ না ধরালেই তিনি অকৃত্রিম আর্তনাদে জ্যাঠামশায়ের নিদ্রাভঙ্গ ঘটাবেন। আমি ভারি সমস্যার মধ্যে পড়লাম—যদি বা খোকা বাঁচতো, বড়দির চিকিৎসার ঠেলায় সকাল পর্যন্ত—মানে ডাক্তার আসা পর্যন্ত—টেকে কি না সন্দেহ। অথচ বড়দির চিকিৎসায় সহায়তা না করলে আরেক বিপদ! এদিকে খোকার মৃত্যু, ওদিকে আমার অপঘাত—আমি স্টোভ ধরাতেই স্বীকৃত হলাম।

পুলটিসের হাত থেকে খোকার পরিত্রাণের একটা ফন্দি মাথায় এল। স্টোভ ধরাতে গিয়ে বলে উঠলাম—এই যা, ধরচে না তো! যা ময়লা জমেছে বার্নারে। পোকারটা দাও তো বড়দি?

—সর্বনাশ! পোকার—সে যে জ্যাঠামশায়ের ঘরে!

আমি তা জানতাম। —তাহলে কি হবে? যাও তুমি নিয়ে এসগে। নইলে তো স্টোভ ধরবে না।

—বাবা! জ্যাঠামশায়ের ঘরে আমি যাব না, তার চেয়ে আমি চ্যাঁচাব।

—না না, তোমায় চ্যাঁচাতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।

—ওই সঙ্গে, তাক্ থেকে থার্মোমিটারটাও এনো, জ্বর দেখতে হবে।

খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ গরম! পোকার আনি আর না আনি, থার্মোমিটারটা দেখা দরকার। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জ্যাঠামশায়ের কক্ষে ঢুকলাম, দরজা আব্জানই ছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে জীবন্ত একমাত্র নাসিকা—নাসিকার কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়েই

যদি থার্মোমিটার বাগিয়ে নিতে পারি, তাহলেই আজ রাত্রের ফাঁড়া কাটল।

কাছাকছি এক বেড়াল শুয়েছিল, অন্ধকারে দেখা তো যায় না, পড়বি তো পড় তার ঘাড়েই দিয়েছি এক পা! সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা চেঁচিয়ে উঠেছে—ম্যাঁও!

শুনেছি বেড়ালের দৃষ্টি অন্ধকারেই ভালো চলে, ওরই আগে থেকে আমাকে দেখা উচিত ছিল। আমার পথ থেকে অনায়াসেই সরে যেতে পারতো। নিজে দোষ করে নিজেই আবার তার প্রতিবাদ— আমার এমন রাগ হল বেড়ালটার উপর, দিলাম ওকে কষে এক শূট, মহামেডান স্পোর্টিং-এর সামাদের মতন।

আমার শূটটা গিয়ে লাগল একটা চেয়ারে, সেখানেই যে এটা দাঁড়িয়েছিল জানতাম না। পাজি বেড়ালটা এবার ঠিক নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শূটের প্রতিক্রিয়া থেকে কোনো রকমে আমি টাল সামলে নিলাম, কিন্তু চেয়ারটা চিতপাত হল।

এই সব গোলমালে নাসিকা গর্জন গেল থেমে, কিন্তু আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হল সেই সঙ্গে। ভাবলাম, নাঃ, হামাগুড়ি দিয়ে চার-পেয়ের মতো চলি, তাতে ধাক্কাধুক্কি লাগবার ভয় কম, সাবধানেও চলা যাবে, জ্যাঠামশায়ের নিদ্রা এবং নাসিকা গর্জনের হানি না ঘটিয়ে নিঃশব্দে থার্মোমিটারটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। একটু পরেই আবার নাক ডাকতে লাগল—আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে হামাগুড়ি প্র্যাকটিস শুরু করলাম।

প্রথমেই একটা বস্তুর সংঘর্ষে দারুণভাবে মাথা ঠুকে গেল—হাত দিয়ে অনুভব করলাম ওটা চেয়ার। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে—সুবিধার দিক এবং অসুবিধার দিক; অন্ধকারে হামাগুড়ি-

অন্ধকারে পা সামলানো যায় বটে, কিন্তু মাথা বাঁচানো দায়। যাক, গোল টেবিলটা এতক্ষণে পেয়েছি, এবার হয়েছে, ঘরের মধ্যিখানে পৌঁছে গেছি—এখান থেকে সোজা উত্তরে গেলেই সেই তাক্—যেখানে থার্মোমিটার আছে।

অনেকটা তো গুড়ি দেওয়া হল—কিন্তু তাক্ কই? ভালো করে তাক করতে গিয়ে টেবিলটাকে পুনরাবিষ্কার করলাম—এবার মাথা দিয়ে—এবং দস্তুরমতো ভড়কে গেলাম! একি, এখনো আমি ঘরের মধ্যিখানেই ঘুরছি? আহত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবতে লাগলাম—কি করা যায়?

নূতন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করলাম। এই তো টেবিল—এই একটা চেয়ার—এটা? এটা জ্যাঠামশায়ের পিকদানি—ছিঃ! যাকগে, হাতে সাবান দিলেই হবে—এই তো দেয়াল, এই আরেকখানা চেয়ার; এই গেল গিয়ে সোফা—এ কি? ঘরে তো একটা সোফা ছিল বলেই জানতাম, নাঃ, এবার হতভম্ব হতে হল আমাকে। যে ঘরে দিনে দশবার আসছি যাচ্ছি, তাতে এত লুকোনো সম্পত্তি ছিল জানতাম না তো! আরেকটু এগিয়ে দেখতে হল—আরো কি অজ্ঞাত ঐশ্বর্য উদ্ধার হয়! এই যে দেখছি আরেকখানা চেয়ার—ঘরে আজ এত চেয়ারের আমদানি হল কোত্থেকে! এই যে ফের আরেকটা পিকদানি—ছিঃ, এ-হাতটাতেও আবার সাবান দিতে হল! ছ্যাঃ!

নাঃ, এবার এগুতে সত্যিই ভয় করছিল। ঘরে আজ যে রকম পিকদানির ছড়াছড়ি তাতে আর বেশী পরিভ্রমণ নিরাপদ নয়। দরজাটা কোন দিকে? এবার বেরুতে পারলে বাঁচি—আর থার্মোমিটারে কাজ নেই বাবা! উঠতে গিয়ে মাথায় লেগে গেল—এ কোনখানে এলাম? টেবিলের তলায় বুঝি? টেবিলটা তো ছোট এবং গোল বলেই জানতাম

—এ যে যেখানে যত ঘুরে ফিরেই উঠতে যাই মাথায় লাগে। ঘরের ছাদ নোটিস না দিয়ে হঠাৎ এত নীচে নেমে আসবে বলে তো মনে হয় না। তবে আমার দণ্ডায়মান হবার বাধা এই দীর্ঘ-প্রস্থ বস্তুটি কি? এটাকে নিয়ে ঠেলে উঠব, যাই থাক কপালে।

যেই চেষ্টা করা, অমনি সহসা জ্যাঠামশায়ের নাসিকাধ্বনি স্থগিত হল। ক্ষণপরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—চোর, চোর! ডাকাত! খুনে! ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

ও বাবা! আমি জ্যাঠামশায়ের তক্তপোশের তলায়—কি সর্বনাশ! তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলাম! এখন ওঁকে অভয় দেওয়া দরকার, বোঝানো দরকার চোর নয়, ডাকাত নয়, ভূমিকম্প নয়—অন্য কিছু, নগণ্য কিছু! মিহি সুরে ডাকলাম—মিঁয়াও!

জ্যাঠামশাই যে খুব ভরসা পেয়েছেন এমন বোধ হল না। এবার গলা ফুলিয়ে ডাকতে হল—মঁ্যা-া-া-ও!

বড়দি হ্যারিকেন হাতে ঢুকলেন। জ্যাঠামশাই ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললেন, দেখতো বিনি, আমার তক্তপোশের তলায় কি?

বড়দি আমাকে পর্যবেক্ষণ করে আশ্বাস দিলেন—ও কিছু না, জ্যাঠামশাই, একটা ইঁদুর, আপনি ঘুমোন!

জ্যাঠামশাই সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, ইঁদুর আমার চৌকি ঠেলে তুলবে? ইঁদুরের এত জোর, একি হতে পারে?

বড়দি বললেন, ধাড়ী ইঁদুর যে!

ধাড়ী ইঁদুর! একটু আগে বেড়ালের ডাক শুনলাম যেন। বেড়াল-ইঁদুর এক সঙ্গে, ওরা যে খাদ্য-খাদক বলেই আমার জানা ছিল। যাকগে, আলোটা নিয়ে যা সামনে থেকে— আমার ঘুম পাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্যাঠামশায়ের নাসিকা-বাদ্য বেজে উঠল। বড়দির আড়াল দিয়ে আমিও বিপদ-সঙ্কুল কক্ষ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলাম।

বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে দেখি আর ভোর হতে বাকি নেই—সুদূর আকাশে হীরকাভা দেখা দিয়েছে। রাত ছুটো থেকে এই ভোর পাঁচটা, ওই ঘরে আমি কেবল ঘুরেছি—পায়ে মিটার বাঁধা ছিল না, নইলে জানা যেত কত মাইল মোট হল? তিন ঘণ্টায় তিরিশ মাইল তো বটেই!

বড়দি করুণ কণ্ঠে বললেন, তুমি তো থার্মোমিটার আনতে বছর কাটিয়ে দিলে, এদিকে দেখ এসে, খোকা কেমন করছে!

দেখেই বুঝলাম আর না দেখলেও চলে—খোকার শেষ-মুহূর্ত সন্নিকট! যে সময়ে আমি এন্‌ডিওরেন্‌স্ হামাগুড়ির রেকর্ড সৃষ্টি করছিলাম, আমার ভাগনের অদৃষ্টে সেই সময়ে অন্যবিধ এন্‌ডিওরেন্‌স্ পরীক্ষা চলছিল। দেখলাম, বড়দি নিজেই কোনো রকমে স্টোভ ধরিয়ে নিয়েছেন, ইতিমধ্যে দু-দুবার খোকার বুকে পুলটিস দেওয়া হয়ে গেছে। ওষুধের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত বোতল ফাঁক! 'ওষুধের কি হল' জিজ্ঞাসা করতেই বড়দি জানালেন, দশ মিনিট অন্তর এক চামচ করে খাওয়ানো হয়েছে, তবু তো কই কোনো উপকার দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম, উপকার দেখা যেত যদি খোকার বদলে তুমি খেতে।

হাত টিপে দেখলাম, কিন্তু খোকার নাড়ি পেলাম না। খোকার আর অপরাধ কি, যে এক বোতল হুপিংকাফ-কিওর ওকে উদরস্থ করতে হয়েছে, তাতে কি আর ওর নাড়ি-ভুঁড়ি নিঃশেষ হতে বাকি

আছে? তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ফোন করলাম—আমাদের খোকা মারা যাচ্ছে।

পায়জামা-পরনেই ডাক্তার ছুটে এলেন, পরীক্ষা করে বললেন, না, মারা যাচ্ছে না। তাছাড়া এর হুপিংকাফই হয়নি। দেখি—বলে খোকার গলার কাছে সুড়সুড়ি দিতেই খোকা বেদম কাশতে শুরু করল এবং কাশির ধমকে বেরিয়ে এল সূক্ষ্মতম কি একটা জিনিস। হাতে নিয়ে ভালো করে দেখে ডাক্তার বললেন, এ তো পাইন কাঠের টুকরো দেখছি! খোকা বোধ হয় পাইন কাঠের কিছু চিবুচ্ছিল—তার ভগ্নাংশ ভেঙে গলায় গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বড়দি বললেন, হুপিংকাশি নয়, তাহলে এটা কি কাশি? বড়দির ক্ষোভের কারণ ছিল, সমস্ত রাত ধরে এক সঙ্গে হুপিংকাফ, নিউমোনিয়া ও সর্দিগর্মির চিকিৎসার পর সেই প্রাণান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ গেছে জানলে কার না দুঃখ হয়?

আমি উত্তর দিলাম, এক রকম কাষ্ঠ-হাসি আছে জানো তো বড়দি? এটা হচ্ছে তারই ভায়রা-ভাই—কাষ্ঠ-কাশি।

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কি যে করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি আজকাল অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা না হলে সে হয়তো একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বসতো। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে তো অধর্ম করে অমনি মেরে ফেলা যায় না। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কি না, তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

সে মনে মনে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্ব তো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠার চারটে পা, ঘোড়ারও,—সবদিকেই প্রায় মিল আছে, যা কিছু তফাত তা কেবল লেজের আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধান কি আর শাস্ত্রে নেই? নিশ্চয়ই আছে।

এক কালে অবশ্য ঘোড়াটা খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অবধি আজকাল কোনো কাজেই লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকা একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকারী চিঠি, কখন কি খায় স্থির নেই। সেদিন তো



জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। পৃষ্ঠা ৩১

কাশ্মীরী শালের আধখানাই প্রায় সাবাড় করেছে। তাছাড়া রান্নাঘরের দিকেও বেশ নজর আছে।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুর মতো প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক আওয়াজ কিংবা বেগুন ভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায়? পাড়াগাঁয়ে মেটে বাড়ি পঞ্চাননদের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নীর কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুন ভাজা না দিয়ে? বেগুন ভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যই সে পেট ভরে বেগুন ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নী বেগুন না ভেজে, বোধ হয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মতলবেই, বেসন দিয়ে বেগুনী ভাজছিলেন। গন্ধ পাবামাত্র ঘোড়াটা সেখানে হাজির! দু-একবার সে গিন্নীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চিঁহি চিঁহি!

সংস্কৃত ভাষায় যার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নী কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুনী আত্মসাৎ করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে শুরু করে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি আর পঞ্চাননের চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ভাটপাড়া সে যাবেই।

গিন্নীকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে আশকারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বলছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে।

তার পরের দিনই সে কলকাতা থেকে সত্ত আনানো পঞ্চাননের টর্চ লাইটটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে চিবিয়ে যখন বুঝল যে ওটা ঠিক বেগুনী নয়, তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ লাইটটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন তো অগ্নিশর্মা। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই ? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি ?

ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে—চিঁহিঁহি ! অর্থাৎ—যা বল তুমি !

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্য কি শাস্তি ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ট এসে পরামর্শ দিল—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না।

পঞ্চানন ভেবে দেখল, একথা বেশ। ওর শাস্তির ভারটা মশার উপরে ছেড়ে দেওয়াটা মন্দ না।

কিন্তু কাঁচি নিয়ে উত্তোগ-আয়োজনের মুখেই ন-মেয়ে রাধারানী বলল, বাবা করছ কি ! মশার কামড়ে তাহলে ও আমাদের মশারির মধ্যে এসে ঢুকবে যে।

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, একটা ভাবনার কথা বইকি। ঘোড়াটার যে-রকম বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব, তাতে সবই ওর পক্ষে সম্ভব। মশারির মধ্যে ঢোকা কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।

এমনই সমস্যার মুহূর্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত। —কিহে পঞ্চানন, কি হচ্ছে ?

—এই ভাই, ট্রেন্ করছি ঘোড়াকে।

—তুমি হর্স ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে ?

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে, আর ভাই, শিক্ষা না দিলে নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

—তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছ! আমাদের পাড়াই মাড়াও না তু বছর থেকে—ব্যাপার কি?

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল, কিসের দেনা!

—সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর তুই আগে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলাম বটে। মনে ছিল না ভাই।

জ্যোতিষ বোস ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা পঞ্চানন জানতো। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এত বেশী হিসেবী হয়ে উঠবে যে, চার আনা পয়সার কথা তু বছর ধরে মনে করে রেখে ভিন গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আসবে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাপ পাঁচশ টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতী কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন আশ্চর্য হল।

—তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হল তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে; নিজে গিয়ে দেখতে পার একদিন। এইবার একটু গা করে দিয়ে দাও।

—কি যে বল তুমি? সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এত দূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে। রাধু, তোর মা'র কাছ থেকে চার আনা নিয়ে আয় তো।

আর বলগে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুনী ভাজতে। বেগুনী দিয়ে তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ হে! তার সঙ্গে কাঁচা-লঙ্কা—

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বলল, তা হবে'খন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই—

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বলল, চার আনা নেই কি রকম?

—আহা, বুঝতে পারছ না! সুদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও আমায়।

—য়্যাঁ? পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই—কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কি সহজ, তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে, তা কে জানতো? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠ-হাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো জলে পড়বে না। বস, জিরোও, গল্প কর—অনেকদিন পরে দেখা।

—হ্যাঁ, বসব বইকি! বেগুনীও খাব! কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো!

পঞ্চানন মনে মনে মতলব এঁটে বলে, এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এতটা পরিশ্রম করা কি ভালো তোমার পক্ষে ? একটা ঘোড়া রাখ না কেন ? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও। দেখছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে দৃক্‌পাত করে জবাব দেয়, বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেক দিন থেকে ভাবছি কথাটা। সত্যিই, এ বয়সে আর হাঁটা-চলা পোষায় না। কিন্তু মনের মতো ঘোড়া পাই কোথায় ?

—কি রকম মনের মতো শুনি ?

—এই ধর খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁটবে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহলে কি হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে ?

—তা সে রকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায় ? কিনে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটা কি কম তেজী ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপ, তাহলে ও হাঁটছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এমন বিনয়ী, এমন নম্র স্বভাব—মানে সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়ার।

—তা ভাই, তোমার এই ঘোড়াটির মতো শিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায় ? আমি তো আর তোমার মতো ট্রেনার নই। তা তোমার ঘোড়াটি কত দিয়ে কিনেছিলে ?

—দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মোটে পনোরো টাকায়।

—তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে ঘোড়াটা আমাকে দাও-না কেন? তোমার তো এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই নাও দশ টাকার নোট—

—না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।

—আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন্ করার ক্যাপাসিটি আছে! ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশী লাভ বা নাই করলে। এই নোটখানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে দেখ, পৌনে তিন পাই যোগাড় করা তোমার পক্ষে শক্ত হত না কি?

পঞ্চানন হাসি চেপে আমতা আমতা করে বলে, তা তুমি যখন এত করে বলছ। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম না হয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

—ভালোই হল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলাম তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলাম পথে তো তোমার বাড়ি পড়বে, দেখা করে টাকাটা নিয়ে যাই। ভালোই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতো?

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চানন যা বলেছিল, হাঁটছে বলে মনেই হয় না; অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুশী। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, বাঁচা গেল এতদিনে! আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লাভ! অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলাম,

তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তা। পৌনে তিন পাই দেওয়া বেজায় শক্ত হত।

কেবল গিন্নী একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন—খেতে পেত না বেচারা, তাই ও রকম ছোঁ-ছোঁ করতো! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কি খায়—সে-সব ও কখনো চোখেও দেখেনি। টর্চ খাবে, বেগুনী খেতে চাইবে, তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালা—

পঞ্চানন বলল, তাহলে ঘোড়াটার ভাগ্য বলতে হবে। জ্যোতিষরা বড়লোক, সুখে থাকবে ওদের বাড়ি। আমরা গরীব মানুষ; নিজে-দেরই দানা পাই না, কোথায় পাব ঘোড়ার দানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার তিন গুণ সময় লাগল জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারি খুশী। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেছেন, কিন্তু একবারও পড়ে যাননি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু কষ্ট হয়েছে। ওঠার সময় তিনি টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাত হল না পর্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝল তাঁর ইঙ্গিত, না কান দিল তাঁর সাধ্যসাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই, লাফিয়ে নামতে হল, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি কিংবা তিনি একটুও জখম হননি।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই আলাপ ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুকতেই তিনি 'হ্যালো মিস্টার বোস' বলে

তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে দানা দেবার হুকুম হল আরদালীর উপর।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময়ে আস্তাবল থেকে এক বিরাট আওয়াজ এল—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি ব্যাপার? ম্যাজিস্ট্রেট এবং জ্যোতিষ দুজনেই চমকে উঠলেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনো শোনেননি। এমন কি, যে ঘোড়া ডার্বি জিতেছে, সেও এ রকম উচ্চ-ধ্বনি করে না। দুজনেই আস্তাবলের দিকে ছুটলেন। সেখানে তখন অনেক লোক জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবল করছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

ঘোড়ার সামনে দু বালতি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা ওসব স্পর্শও করেনি। সে বোধ হয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বালতির দিকে তাকাচ্ছে, আর তার ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে উঠছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যাবে সবাই দারুণ ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশীক্ষণ মাথা ঘামাতে হল না কাউকে।

হাসতে হাসতে ঘোড়াটা মারা গেল।

মহাপুরুষের সিদ্ধিলাভ

সেবার গ্রীষ্মকালটা যেন একমাস আগেই এসে পড়েছিল, দারুণ গরমে আম-কাঁঠাল সব আগাম পেকে উঠল। কিন্তু সামার ভ্যাকেশানের তখনো ঢের দেরি। বোর্ডিংএ আমাদের মন তো আর টেকে না! ছুটিটা এসে পড়লে হয়, বাড়ি গিয়ে বাঁচি!

আমরা সত্তর আশীজন ছেলে সুদূরবর্তী পাড়াগাঁর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলার স্কুলে পড়তে এসেছি, বাধ্য হয়ে বোর্ডিংএ থাকি। বাধ্য হয়ে থাকা ছাড়া কি বলব, যা খাওয়া-দাওয়ার ছিরি—রেঙ্গুন চালের ভাত, লাল রঙের এমন হৃষ্টপুষ্ট ভাত তোমাদের অনেকে চোখেও দেখনি; তার সঙ্গে জলবত্তরলং ডাল আর এই এক টুকরো একটুখানি মাছ,—ঝোলের বর্ণনা না-ই দিলাম! এই খেয়ে দেহ যদি বা টেকে, মন টেকে না। কোথায় বাড়ি যাব, সকালে উঠেই একবাটি মুড়ি আর এক টুকরি আম নিয়ে বসব; ছুপুরে আবার ছুধ দিয়ে ভাত দিয়ে আমের রস দিয়ে আরেক প্রস্থ হবে—ভাবতেও জিভে জল আসে!

আমাদের মধ্যে জগা-ই হচ্ছে মাতব্বর, সে বললে, আয়, হেডমাস্টারের কাছে ছুটির দরবার করিগে!

জগা মাতব্বর, কেন না সে সবার সেরা স্পোর্টস্‌ম্যান, ফুটবল ও ক্রিকেটে সমান চৌকস; হাই-জাম্প, লং-জাম্প ও বল থ্রোইংএ তার জুড়ি নেই। তার প্রতি মাস্টারদের যেন একটু পক্ষপাত আছে, সে



···আমরা দেখলাম···একটা মড়ার মাথার খুলি   পৃষ্ঠা ৩৭

ফেল হয়ে গেলেও বরাবর প্রোমোশন পেয়ে এসেছে; এখন ফার্স্ট ক্লাশে উঠে আর কিছুতেই টেস্টএ এলাউ হতে পারছে না। জগা বলে, জানিস, আমি পাস করে বেরিয়ে গেলে তোদের স্কুলের মুখ রাখবে কে? আর সব স্কুলের সঙ্গে কম্পিটিশন ম্যাচে তোরা কি আর জিততে পারবি—তাই আমাকে ফেল করিয়ে এমনি করে আটকে রাখছে।

আমরা তার কথা বিশ্বাস করতাম। স্বয়ং সে ছুটির দরবার করবে জেনে আশ্বস্ত হৃদয়ে আমরা সবাই তার পিছু পিছু গেলাম। হেডমাস্টার মশাই শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, কি? এখনো কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা হয়নি, এখন ছুটি? যাও যাও, পড়গে মন দিয়ে—

—বড্ড গরম পড়েছে সার্—

—গরম পড়বে না তো কি? শীতকালে বড্ড শীত পড়বে, গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গরম পড়বে, বর্ষাকালে ভারি বর্ষা হবে—এ তো জানা কথা। তাই বলে, পড়াশুনা কে ছেড়ে দিয়েছে? জগা, তোমার বাড়ি কি দার্জিলিং যে বাড়ি যেতে চাইছ? সেখানে গরম পড়েনি? যাও যাও, পড়গে, সময় নষ্ট কর না।

জগা বিফল হল—এ রকম ঘটনা আমাদের বোর্ডিংএর ইতিহাসে এর আগে ঘটেনি। ছুটি না পাওয়াতে আমাদের দুঃখ যত না হোক, জগার লজ্জা তার চারগুণ। কিন্তু অপ্রস্তুত হবার ছেলে সে নয়, বললে, ছুটি আদায় করি কি না, ছাখ তোরা!

রোজ সন্ধ্যায়, ছেলেরা ফুটবল খেলে মাঠ থেকে ফিরলে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে রোল-কল হত। তিনি নিজে সবার নাম ডাকতেন। সেদিন সন্ধ্যায় রোল-কলের সময় জগার সাড়া না পেয়ে তিনি ভারি

চটে গেলেন; আমাকে ডেকে বললেন, হাবু, যা একটা বেত কেটে নিয়ে আয়!

ব্যাপার যতদূর বোঝা গেল তা এই, ছেলেদের মধ্যে ছুটির হুজুক তোলার জন্য সকাল থেকেই হেডমাস্টার মশাই জগার উপর চটেছিলেন, তারপরে সে আজ স্কুল কামাই করেছে, অথচ দুপুরে হোস্টেলেও ছিল না। এখন রোল-কলের সময়েও তার পাত্তা নেই! আমি বেত নিয়ে হাজির হতেই, তাঁর হুকুম হল—যা, জগাকে ধরে নিয়ে আয়!

আমি ধরে আনব—জগাকে? চটেছেন বলে কি সারের মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? যে-জগা ব্যাকে খেললে অন্য দলের ফরোয়ার্ডদের দুর্বিপাক, আর ফরোয়ার্ডে খেললে বিপক্ষের ব্যাকের এবং গোলকির দফা রফা, তাকে ধরে আনব কি না আমি! আর কিছু না, হাত যদি না-ও সে চালায়, কেবল যদি হাই-জাম্প আর লং-জাম্পের সাহায্য নেয়, তাহলে তো এক মুহূর্তেই সে আমার নাগালের একদম বাইরে!

কিন্তু দরকার হল না, পর মুহূর্তেই শ্রীমান জগার সাড়া পাওয়া গেল। তাকে দেখে হেডমাস্টার মশাই গর্জন করলেন—এগিয়ে এস—বলে টেবিলের উপর সপাৎ করে বেতটা একবার ঝাড়লেন। যেন ওটাকে রিহার্সাল দিয়ে নিলেন।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল, হেডমাস্টার মশাই যেখানে বেত ঝাড়লেন ঠিক তারই উপরে সহসা কড়িকাঠ থেকে সশব্দে একটা চাপড়া খসে পড়ল। একাশী-জোড়া বিস্ফারিত চোখ মেলে আমরা দেখলাম তা বালির চাপড়াও নয়, টালির টুকরাও নয়—আস্ত একটা মড়ার মাথার খুলি।

হেডমাস্টার মশায়ের হাত থেকে বেত খসে পড়ল ; আমাদের মধ্যে কয়েকজন ভয়ে চীৎকার করে উঠল—তারপর সব নিস্তব্ধ। কারো যেন নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না।

হেডপণ্ডিত মশাই প্রথম কথা কইলেন—আজ তিথিটা কি হে ? ত্রয়োদশী—কই তিথি দোষ তো নেই। তবে বেস্পতিবারের বারবেলা বটে। দাও তো হে মাথার খুলিটা, ওটা আমার কাজে লাগবে।

স্কালটা হাতে করে, গম্ভীরভাবে তিনি বেরিয়ে গেলেন। হেড-পণ্ডিত মশাই তান্ত্রিক মানুষ, কালী-সাধনা করেন। অমাবস্যা চতুর্দশীর গভীর রাত্রে শ্মশানে তাঁর গতিবিধি আছে বলে কানাঘুষা। কে জানে, ওই খুলিটা তিনি কোন কাজে লাগাবেন !

ততক্ষণে হেডমাস্টার মশাই সামলে উঠেছেন, কম্পিত কণ্ঠের ভেতর থেকে তাঁর বাণী শোনা গেল—যাও সব, পড়তে বসগে, হৈ-চৈ কর না।

বলা বাহুল্য, আমরা হৈ-চৈ করছিলাম না, তা করবার মতো উৎসাহ তখন আমাদের কারো কণ্ঠেই ছিল না। নীরবে আমরা যে যার সীটে গিয়ে বই খুলে বসলাম ; কিন্তু পড়ব কি, সবার বুকের মধ্যে কি রকম যেন কাঁপুনি ধরে গেছে। দুরু দুরু বুকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই কি যেন আবছায়া দেখি ! এক নিমেষে অত লোকজনভরা অতবড় বোর্ডিং যেন একেবারে ভূতের রাজত্ব হয়ে উঠল।

সে-রাত্রে আর পড়াশুনা হল না ; হেডমাস্টার মশায়ের হুকুমে তাড়াতাড়ি দুটো নাকে-মুখে গুঁজে ছেলেরা সব শুয়ে পড়ল। আমি হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে থাকতাম, তিনি নিজের মশারি খাটানো সেরে আমার দিকে উৎসুক নেত্রে তাকিয়ে বললেন, আলোটা আজ জ্বালা থাকলে কি তোমার ঘুমের অসুবিধা হবে, হাবু ?

—না সার্।

—অন্ধকার ঘরে তুমি ভয় পেতে পারো কি না, তাই বলছি। নইলে আমার কোনো দরকার নেই। নিভিয়ে দিই তাহলে, কেমন?

—দিন তবে।

কিন্তু জ্বালানো থাকলেই যেন ভালো ছিল। জমাট অন্ধকারের মধ্যে কাদের যেন ছায়ামূর্তি দেখতে লাগলাম। মনে হতে লাগল, এই বুঝি চৌকির তলা থেকে কে পা-টা টেনে ধরে! যতদূর গোটানো সম্ভব পা-দুটো গুটিয়ে নিলাম, হাতের তালু আর পায়ের চেটো প্রায় একাকার করে ফেললাম। এই ভাবে একটু তন্দ্রা আসছিল যেন, হঠাৎ কখন চীৎকার করে উঠেছি। ঘরের অপর দিক থেকে হেডমাস্টার মশায়ের ভয়ার্ত কণ্ঠ শোনা গেল—কি হল, কি হল হাবু?

—কার যেন হাত আমার কপালে ঠেকল।

—য়্যাঁ?

খানিকক্ষণ উভয়ের আত্মসংবরণ করতে গেল। অবশেষে বুঝতে পেরে বললাম, আমারই নিজের হাত মাস্টার মশাই।

—তাই ভালো! আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে। তুমি যে রকম চেঁচিয়ে উঠেছিলে! কেবল ভয়ের কথা ভাবছ বুঝি তখন থেকে?

—না সার্।

খানিক বাদে আবার হেডমাস্টার মশায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।—হাবু, কাগজের গাদা যেন কে হাঁটকাচ্ছে, নয়?

ভয়ে আমার গলা থেকে শব্দ বেরুল না।

—বোধ হয় ইঁদুর। ভেব না, ঘুমোও। ঘুমিয়ে পড়।

ঘুমিয়ে পড়ব কি, খানিক বাদে যা কাণ্ড শুরু হল, তাকে ভূতের উপদ্রব ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। বাইরের উঠোনময় কারা যেন দাপাদাপি করে ফিরছে। কে যেন রান্নাঘরের কোণের ছাইগাদায় বসে গোঙাচ্ছে, আবার ঠিক আমাদের ঘরের বাইরেই চট্‌-পট্‌ করে হাততালির আওয়াজ! কিয়ৎক্ষণ পরে আমাদের জানালার খড়খড়িগুলো যখন খুলতে আর বন্ধ হতে শুরু হল, হেডমাস্টার মশাই একলাফে আমার বিছানায় এসে বসলেন!

আমি এতক্ষণ মড়ার মতো পড়েছিলাম, সার্‌ আসতে সাহস হল। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কি হবে হাবু?

আমার ততক্ষণে সাহস অনেক বেড়েছে; এমন কি তখন আমার ভয় করতেই ভালো লাগছিল। বললাম, ভয় কি সার্‌?

—না না, আমার ভয় কিসের? তোমার জন্য ভাবছি—

—আপনি বসে থাকুন, তাহলেই আমার আর ভয় করবে না।

—সেই ভালো হাবু। আর তো বেশী রাত নেই, দুজনে বসেই কাটিয়ে দিই।

হেডমাস্টার মশাই কতক্ষণ বসেছিলেন জানি না, আমি কিন্তু বেশ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে দেখি সমস্ত উঠোনময় মড়ার হাড়গোড় ছড়ানো। কিন্তু সকালবেলায় হেডমাস্টার মশাইকে দেখে রাত্রের লোকটিকে আর চেনাই যায় না। তিনি ভয়ানক হাঁক-ডাক জুড়ে দিয়েছেন—এসব হচ্ছে দুষ্টু লোকের কাজ! ভূত আবার আছে না কি? ভূত আমি মানিনে। এক্ষুণি পুলিসে খবর দিচ্ছি; পুলিসের কাছে বাবা চালাকি নয়, সব ধরা পড়ে যাবে।

হেডপণ্ডিত মশাই বললেন, আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? পুলিসে খবর দেবেন দিন, কিন্তু ভূত নেই এ কেমন কথা?

ভূত অবশ্যই আছে তবে তাকে ভয় করবার কিছু নেই, একথা আপনি বলতে পারেন বটে।

—যান যান, আপনি আর কথা কবেন না। ফি অমাবস্যায় শ্মশানে গিয়ে কি যে করেন, আপনিই তো এসব উপদ্রব টেনে এনেছেন!

অত্যন্ত খাপ্পা হয়ে হেডমাস্টার মশাই, বোধ করি, থানাতে খবর দিতেই সবেগে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাকে ডেকে বলে গেলেন, ঘরের কোণে যত সব পুরানো কাগজের জঞ্জাল জড়ো হয়ে আছে, সব সাফ করে কাগজওয়ালাদের বিক্রি করে দাওগে। নইলে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে রাত্রে তো চোখ বুজবার যো নেই।

কাগজের গাদা নাড়তে গিয়ে দেখি, কি সর্বনাশ, তার তলায় এত হাড়গোড় আর মড়ার মাথার খুলি! এসব কে জড়ো করল এখানে? আমি ভয়ে-বিস্ময়ে ভ্যাবাচাকা—এমন সময়ে জগা দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকল।

—খবরদার, কাগজের গাদায় হাত দিবিনে বলছি! ও বাবা, এর মধ্যেই আবিষ্কার করা হয়ে গেছে? যাক, কাউকে বলিসনি। বললে তোকে আস্ত রাখব না!

—এ সব কি ব্যাপার, জগাদা?

কাগজের গাদা আবার আগের মতো ঠিকঠাক করে রেখে আমার হাত ধরে জগা বলল, আয়, তোকে সব বলছি।

তার সমস্ত কীর্তি-কাহিনী ব্যক্ত করে রুমালে বাঁধা একটা জিনিস আমার হাতে দিয়ে বলল, এখন কথা শোন। এটা যেন দেখিসনে। হেডমাস্টার মশাই শুয়ে পড়লে আস্তে আস্তে তাঁর মশারির চালে এটা রেখে দিবি, রুমালটা খুলে নিবি অবিশ্যি। পারবি তো? যদি পারিস, তাহলে কাল থেকে আমাদের ভ্যাকেশান—একেবারে অব্যর্থ।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে আমি বললাম—খুব পারব।

সেদিন ভোররাতের দিকে হেডমাস্টার মশাই এক দারুণ চীৎকার করে উঠলেন। তাঁর আর্তনাদে, আমার কেন, বোর্ডিং শুদ্ধ সবার ঘুম ভেঙে গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে আমাকে বললেন, হাবু, হাবু, আলো জ্বাল—শীগগির।

—কি হয়েছে সার্?

—বলছি, আলো জ্বাল আগে। মশারির মধ্যে কে যেন—

—সে কি?

—কার সঙ্গে যেন মাথা ঠুকে গেল—

মনের ভ্রম নয় তো সার্? কালকের আমার মতো?

—না—না। মাথাটা ফেটে যাবার যোগাড়—আর মনের ভ্রম! আলো জ্বাল, এঃ, কপালটা ফুলে উঠেছে একেবারে!

আলো জ্বাললাম। ততক্ষণে ঘরের বাইরে বোর্ডিংএর ছেলেরা মাস্টাররা সবাই জড়ো হয়েছে। হেডপণ্ডিত মশাই পর্যন্ত খড়ম খট খট করে উপস্থিত। লণ্ঠন ধরে দেখা গেল মশারির চালে একটা আস্ত মড়ার মাথা!

হেডপণ্ডিত বললেন, ওমা! এ যে টাটকা দেখছি, মায় দাড়ি সমেত!

কারো মুখ থেকে একটা শব্দ বেরুল না; তিনিই মাথা নেড়ে আবার বললেন, হুঁ, তা তো হবেই, কাল চতুর্দশী ছিল যে। আজ অমাবস্যা আছে আবার!

চতুর্দশীতেই এই মাথা-ঠোকাঠুকি ব্যাপার, অমাবস্যাতে না জানি কি কাণ্ড হয়! ভাবতেই সবার হৃৎকম্প হল!

হেডপণ্ডিত মশাই বললেন, একে শনিবার, তায় অমাবস্যা! আজ গুরুতর কথা বটে!

ছোট ছেলেদের মধ্যে অনেকে কেঁদে ফেলল, দু-একজনের মূর্ছার উপক্রম হল। জগা মুখখানা অতিমাত্রায় কাঁচুমাচু করে বলল, সার্, আমাদের ছুটি দিয়ে দিন, আমরা বাড়ি চলে যাই, নইলে আমরা বাঁচব না!

হেডমাস্টার মশাই বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের ছুটি। আজ সকালেই যে যার বাড়ি চলে যাও। আমিও সাড়ে এগারোটার ট্রেন ধরি। চতুর্দশীতে মাথা ঠুকে ছেড়ে দিয়েছে, অমাবস্যায় যদি ঘাড় মটকে দেয়! কাজ নেই!

হেডপণ্ডিত মশাই বললেন, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি! কোনো মহাপুরুষ তান্ত্রিক যোগী সন্নিকটে কোথাও সাধনা করছেন, এই ভৌতিক উপদ্রব তাঁরই সিদ্ধিলাভের অনুষ্ঠান—তাছাড়া আর কিছু না। এতে ভয় পাবার কিছু নেই।

জগা বললে, আমারও তাই মনে হয় পণ্ডিত মশাই। কোনো মহাপুরুষ কার্যসিদ্ধির জন্য—

পণ্ডিত মশাই তার সায়-দেওয়াকে ঠাট্টা মনে করে বললেন, হ্যাঁ, তুই তো ভারি জানিস। তুই থাম!

ঘটোৎকচ-বধ

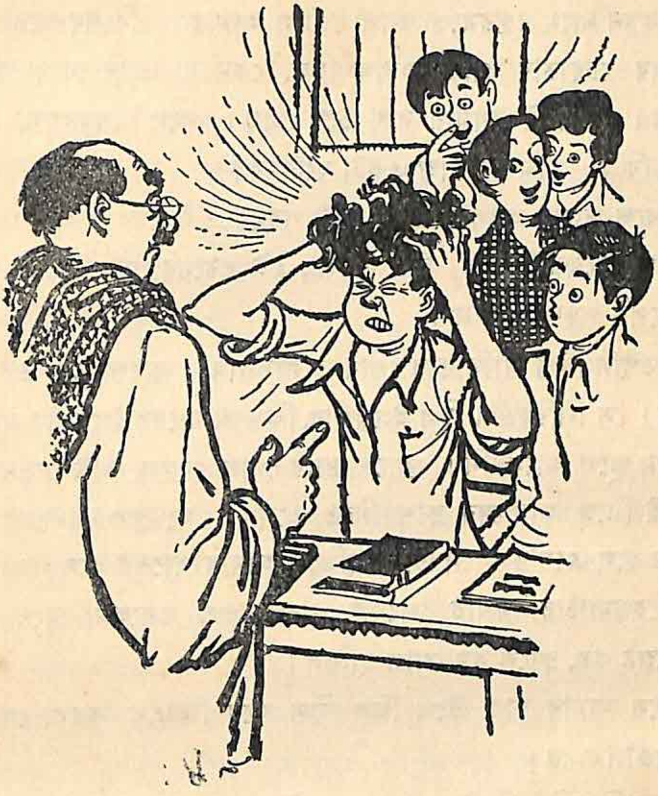
সেই বছরই সে আমাদের ক্লাশে ভর্তি হল।

যেমন ষণ্ডামার্কা চেহারা, তার উপরে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—চুলে তেলও দিত না, চিরুনিও না। রুক্ষ রুক্ষ চুলে তাকে দেখাতো ঠিক গুণ্ডার মতো। নামটাও তার বিদকুটে, সেটা মনে রাখা বা মুখে আনা সহজ ছিল না। উপাধি ছিল ঘটক, সবাই তাই ধরেই তাকে ডাকতো।

আমি বলতাম, ঘটক না ঘটোৎকচ! সেটা অবশ্য মনে মনে।

তার সঙ্গে বিবাদ করা তো বিপজ্জনক ছিলই, বন্ধুত্বও নিরাপদ ছিল না। —কি রে ভালো আছিস? বলে সে যখন বন্ধুর পিঠে বিরাশী-সিকের আদর বসাতো, তখন তার জবাবে ভালো আছি জানানো নেহাত মিথ্যা কথা হত। বরং 'হ্যাঁ, একটু আগে ছিলাম' বললেই যথার্থ উত্তর হত। অকস্মাৎ অমন কিল খাওয়ার পর মানুষ কখনো ভালো থাকতে পারে?

নিঃস্বার্থভাবে চড়-চাপড় বসানো ছাড়াও তার আরও গুণ ছিল। ক্লাশের প্রায় প্রত্যেক ছেলের একটা করে অদ্ভুত নাম সে বের করেছিল। সেই নামে তাদের ডাকতো—যাকে ডাকা হত তখন সে ছাড়া আর সবাই ভারি হাসতো। একদিন সে আমাকেই ডেকে বসল—কিগো লট্‌পট্‌ সিং, কি হচ্ছে?



দু হাতে ভীষণভাবে মাথা চুলকাতে লাগল পৃষ্ঠা ৫২

নতুন নামে দস্তুরমতো আপত্তি ছিল আমার। বিশেষ করে এতে আমার চেহারার প্রতি কটাক্ষ ছিল, কেন না ভারি রোগা ছিলাম আমি। কাজেই আমার রাগ হয়ে গেল। বলে ফেললাম, আর তুমি কি? তুমি যে আস্ত একটা ঘটোৎকচ!

বলে ভালো করলাম না। সেটা পরমুহূর্তেই টের পেলাম। টের পেলাম নিজের পিঠে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা আমি আদপেই পছন্দ করি না।

তখুনি কিন্তু আমি তার শোধ তুলেছিলাম। অবশ্য আর এক দিক দিয়ে। সে পিরিয়ডটা ছিল ইংরেজীর, কিন্তু আমাদের ইংরেজীর মাস্টার সেদিন স্কুলে আসেননি। ক্লাশে ভারি গোল হচ্ছিল, তাই হেডমাস্টার মশাই নিজে আমাদের ক্লাশ নিতে এলেন। ঘটোৎকচ নিজের সীট ছেড়ে চলে এসেছিল, সে তাড়াতাড়িতে আমার পাশেই বসে পড়ল।

হেডমাস্টার মশাই তাকেই প্রথম প্রশ্ন করলেন, মুখে মুখে ট্রান্স্লেঠ কর, ক্লাশে বড় গোল হচ্ছিল।

সে আমার হাত টিপে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, গোলের ইংরেজী কি রে!

আমি চুপি চুপি উত্তর দিলাম, রাউণ্ড।

—আহা সে গোল নয়, গো—ল।

—কি গোল? ফুটবল খেলার গোল? সে তো জি-ও-এ-এল।

—দূর ছাই, তা নয়—

হেডমাস্টার মশাই তাড়া দিলেন, সোজা ট্রান্স্লেশন, এত দেরি কিসের?

উপায় না দেখে সে বলে ফেলল—There was much rounds in the class.

হেডমাস্টার মশাই এত অবাক হয়ে গেলেন যে তাকে কিছু না বলে আমাকে বললেন তার কান ম'লে দিতে। তার পর তাকে ছেড়ে আর সব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কান ম'লে দিতে দিতে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, much নয়, ওটা big rounds, বড় গোল কি না!

সে-কথা কানে না তুলে সে বলল, যা জোরে মলেছিস, আচ্ছা, দেখব তোকে ছুটির পর।

সমস্ত ক্লাশ ঘুরে আবার তার পালা এল, হেডমাস্টার মশাই তাকে প্রশ্ন করলেন, আমি ঐ কাপড়টি পরি,—পারবে এটা ?

বড় রকমের ঘাড় নেড়ে সে বলল, হ্যাঁ।

বলল এবং উঠেও দাঁড়াল, কিন্তু তার পরে আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। মুখ নড়তে থাকে কিন্তু মুখ আর খোলে না। ভাবটা যেন এই যে, এর অনেক রকম উত্তর তার জিভের আগায় এসেছে, কিন্তু কোনটা বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না দেখে সে আমাকে একটা চিমটি কাটল, নীচু গলায় বলল, কাপড় পরা কি হবে রে ?

—না, আমি বলব না। তুমি যে ছুটির পর আমাকে দেখাবে বলেছ ?

—না ভাই, দেখাব না, তুই লিখে দে।

আমি রাফ-খাতাটা টেনে নিয়ে তার দেখার সুবিধার জন্য এক পাতা জুড়ে বড় বড় ছাঁদে লিখলাম—কাপড় পরা—to read the cloth.

সে তখন চট্‌পট্ উত্তর দিল, আই রিড ছাট ক্লথ।

হেডমাস্টার মশায়ের বিস্ময় তখন সপ্তমে উঠেছে—য়্যাঁ ? কাপড় পরার ইংরেজী তুমি জানো না ? পরার ইংরেজী ! পরা !

—পড়ার ইংরেজী ? পড়া—পড়া ? ও ! মনে পড়েছে—to fall ! Stand up on the bench. সমস্ত ঘণ্টা থাকবে, নেমেছ কি ফাইন। —বলে হেডমাস্টার মশাই চলে গেলেন। ক্লাশশুদ্ধ সবাই ঘটোৎকচের এই হুরবস্থাটা উপভোগ করলাম। যখন তখন মুষ্টি-যোগের জন্য আমরা কে না ওর উপর চটা ছিলাম ?

বলা বাহুল্য, সেদিন শেষ পিরিয়ডে আমার ভারি পেট কামড়াতে লাগল। ক্লাশ-টিচারের কাছে ছুটি নিয়ে বেরুচ্ছি, ঘটোৎকচ বইয়ের আড়াল থেকে ঘুষি দেখাল। ভাবখানা যেন এই—বড্ড ফসকে গেলি আজ। তা বলে নিস্তার নেই তোর !

তার পরদিন কিন্তু তার সঙ্গে আমার ভারি ভাব হয়ে গেল। হলও খুব অদ্ভুত রকমে।

বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে একটা ছারপোকা ভারি কামড়াচ্ছিল আঙুলে, অনেক কষ্টে তাকে খুঁজে বের করে খতম করতে যাচ্ছি, সে বলে উঠল, আহা মারিস নে, মারিস নে, বেচারাকে মারিস নে।

সহপাঠীর প্রতি যে এত নিষ্ঠুর, ছারপোকার প্রতি তার এমন দয়া ! বিস্মিত হয়ে বললাম, তবে কি করব একে ? মাটিতে ছেড়ে দি ?

সে ব্যস্ত হয়ে বলল, আরে না না, পালিয়ে যাবে যে ! দাঁড়া। ··· আহা বেশ ছারপোকাটি তো। কেমন মোটাসোটা ! দেখতেও কি চমৎকার ! গায়ের রঙে কালচে লাল আর লালচে কালো একসঙ্গে মিশ খেয়েছে। এ রকম আমার একটিও নেই।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম—বলে কি এ ?

—ছারপোকাটা আমায় দিবি ? তাহলে আর তোকে মারব না।

আমি বললাম, এক্ষুণি, এক্ষুণি। যেখানে তোমার খুশি একে নিয়ে যাও।

খুব আনন্দিত হয়ে পকেট থেকে একটা বেঁটে চেহারার গোলমুখো শিশি সে বার করল। ও বাবা! তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ছারপোকা! লক্ষ লক্ষ না হলেও হাজার হাজার তো বটেই! আমার উপহারটিকে সযত্নে তার মধ্যে পুরে নিয়ে বলল—এতেই ধরে রাখি ওদের। আমার অনেক দিনের পোষা!

—পাখী, খরগোস এ সব পোষে দেখেছি। ছারপোকা আবার কেউ পোষে না কি?

—ছারপোকার তুই কি জানবি? আমি অনেক দিন থেকে ওদের সঙ্গে মিশছি, ওদের নাড়ী-নক্ষত্র সব আমার জানা। ওদের বুদ্ধির কথা ভাবলে—

কিন্তু টীচার ক্লাসে এসে পড়ায় ছারপোকার কাহিনী মাঝখানেই তাকে থামাতে হল। সেজন্য সে ক্ষুণ্ণ হল ভারি।

টিফিনের সময় পাশের গ্রামের টীম এসে আমাদের চ্যালেঞ্জ করল ফুটবল ম্যাচে। ওরা ভারি গোঁয়ার—হারতে থাকলেই ওদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, বল ছেড়ে দিয়ে অপর দলকে পিটতে শুরু করে দেয়। গত বছর আমাদের বেচারামের পা ভেঙে দিয়েছিল, তার স্কোরেই ওরা one-nill-এ হেরে যায়। তাই ওদের সঙ্গে খেলতে আমাদের উৎসাহ ছিল না।

কিন্তু ঘটোৎকচ বলল, আরে এবার আমি আছি। ভয় কিসের? সব দেব তুলো ধুনে!

কিন্তু মাঠে গিয়ে ঘটোৎকচ হল গোলকিপার! আমরা বললাম, না না, তুই আমাদের সঙ্গে ফরোয়ার্ডে আয়।

সে বললে—'আরে এখন কি! খেলা শেষ হোক না! তখন ধুনে দেব।

বেচারামের কথা আমার মনে পড়ল! বেচারার পা সেরেছে বটে কিন্তু জীবনে তাকে বল ছুঁতে হবে না। অবশ্য পা-ভাঙাকে আমি কেয়ার করি না, কিন্তু আসছে হপ্তায় মামার বাড়ি যাব যে—। আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম যেন আমরা হেরে যাই, এমন ঢোল হারা হারি যে, ওরা খুশী হয়ে সন্দেশ খাওয়ায়।

কিন্তু হারব যে তার কোনো উপায় দেখতে পেলাম না। ওরা বল নিয়ে এগুতেই পারে না—এগোনো দূরে থাক, নিজেদের গোল-এরিয়ার ভেতর থেকে বল ক্লিয়ার করাই ওদের মুশকিল! বিপদ অনিবার্য দেখে আমি খুব সাবধানে খেলতে লাগলাম—পাছে ওদের না গোল দিয়ে ফেলি। আমাদের কেউ শূট করেছে, তাতে গোল নির্ঘাত—বাধ্য হয়ে আমাকেই বল আটকে গোল বাঁচাতে হয়। কর্নার হতে যাচ্ছে, ওদের কর্নারের বল কেড়ে নিয়ে আমিই আউট করে দিই!

কিন্তু কপালের লেখন খণ্ডাবে কে? ভাবলাম এবার আস্তে একটা শূট করি, গোলকিপার অনায়াসেই তা আটকে ফেলবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেই বলটাই গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে গোল হয়ে গেল। তারপর থেকেই ওরা যেমন করে আমাকে ছেঁকে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে ব্যাকের সঙ্গে আমাকে জায়গা বদল করতে হল। প্রাণের ভয় আমি করি না, কিন্তু পা বাঁচাতে হবে তো!

গোল খেয়ে ওরা একটু গোঁ করে খেলতে লাগল। দু-একবার বল নিয়ে এগিয়েও এল, কিন্তু গোল দেবার কোনো লক্ষণই তাদের দেখলাম না। দৈবাৎ যদি গোলটা শোধ হয়ে যায় তো বাঁচা যায়। খেলা সেরে আমাদের ফিরতে তো সন্ধ্যে,—হারলে ওরা কি আর আস্ত ফিরতে দেবে?

অবশেষে অনেকক্ষণ পরে ওরা একটা শূট করল গোলের মুখে।

ঘটোৎকচ ভাবল আমি শূট ফিরিয়ে দেব, কিন্তু আমি দেখলাম এ সুযোগ আর ছাড়া নয়। বলটা ছেড়ে দিয়ে ঘটোৎকচকে এমনভাবে আড়াল করলাম যে আটকাবার কোনো সুবিধাই সে পেল না।

গোল দিয়ে ওরা যা লাফাতে লাগল—সে এক দৃশ্য! দেখে আমার আনন্দ হল! তারপর শেষ দশ মিনিট দ্বিগুণ উৎসাহে ওরা আমাদের চেপে রইল। কোনো রকমে আর একটা গোল খেলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভাবলাম আশা সফল হবে, কিন্তু এমনি ওদের শূট করার কায়দা যে গোলে মারলে সে বল গোলপোস্টকে সেলাম করে দশ হাত দূর দিয়ে বেরিয়ে যায়! সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না, নিজেই নিজের গোলে শূট করে দিলাম। আমিও গোল দিলাম আর খেলাও ওভার হল।

ওদের হাত থেকে তো কোনো গতিকে বাঁচলাম, কিন্তু পড়লাম ঘটোৎকচের কবলে। গোড়ায় জিতিয়ে আমিই শেষে ডুবিয়ে দেব, এমনটা ও আশা করেনি। আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম—ভাই, খেলা আর পরীক্ষা, ও-দুটোই হচ্ছে 'লাক'! পড়লে-শুনলেও কিছু হয় না, ভালো করে খেললেও না। এই তো তুমি এত পড় কিন্তু কাল ক্লাশে হেডমাস্টারের কাছে—! বরাত ভাই, বরাত!

কিন্তু ও কি বোঝবার? ঘুষি বাগিয়ে আমার দিকে এগুচ্ছে, এমন সময়ে সাঁই করে কোত্থেকে একটা ইট এসে পড়ল। তারপর আর একটা। ভেবেছিলাম জিতলে ওদের রাগ পড়বে, হয়তো সন্দেশ খাওয়াবে, কিন্তু শেষে কি না জলযোগের বদলে ইট-যোগ! আমরা আর কোনো দিকে না চেয়ে পাঁই পাঁই করে দৌড়তে শুরু করে দিলাম।

খানিক দূর দৌড়ে দেখি আর ইট আসছে না, কিন্তু ঘটোৎকচ কই? সে তো আমাদের সঙ্গে নেই! তবে কি সে একাই তাদের

তুলো ধুনতে লেগে গেছে না কি? যা গোঁয়ার সে—সব পারে। ফিরলাম তার খোঁজে। দেখি, সে এক গাছে উঠে বসে আছে। আমরা কোথায় দৌড়ে মরছি আর সে কি না নিরাপদে গাছে চেপে অবলীলাক্রমে তাদের ইট চালানো আর আমাদের দৌড়-ঝাঁপ দেখছে মজা করে! আমাদের দেখে সে গাছ থেকে নামল। নেমেই আমার দিকে চেয়ে বলল, কাল ইস্কুলে এর শোধ তুলব। তারপর সমস্ত রাস্তা আর কথাই সে বলল না।

পর দিন আমি ক্লাশে গেলাম ইস্কুল বসে গেলে পরে। আমি যাবা মাত্রই ঘটোৎকচ কটমট করে আমার দিকে চাইল, তারপর টীচারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিকবাদেই সে ফিরে এল, কিন্তু ফিরে নিজের জায়গায় না গিয়ে বসল এসে আমার পাশে। আমি মনে মনে কাঁপতে লাগলাম—এই বুঝি কোপ বসায়!

মাস্টার মশাই ক্লাশে ছিলেন বলে বিশেষ কিছু করতে পারছিল না, কিন্তু যা এক-একটা রাম-চিমটি কাটছিল তাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল মাস্টার মশাই চলে গেলে ওর কিলগুলো কি আন্দাজের হবে। আত্মরক্ষার জন্য আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। আস্তে আস্তে ওর পকেট থেকে ছারপোকার শিশিটা বার করে নিলাম। সুযোগ বুঝে ছিপি খুলে তার অর্ধেক ছারপোকা ওর মাথায় ছেড়ে দিয়ে আবার শিশিটা তেমনি ওর পকেটে রেখে দিলাম।

একটু পরেই ঘটোৎকচ একেবারে লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ চীৎকার! তার পরেই সে দু হাতে ভীষণভাবে মাথা চুলকাতে লাগল।

ব্যস্ত হয়ে টীচার জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল, হল কি?

ক্লাশের সব ছেলে অবাক হয়ে ওকে দেখছিল, বিকৃত মুখে ও জবাব দিল, ভয়ানক কামড়াচ্ছে।

—চুল ছিঁড়লে কি মাথা কামড়ানো সারে? যাও, জল-খাবারের ঘরে গিয়ে চুপ করে শুয়ে থাক গে।

—মাথার ভেতর নয়, বাইরে সার্।

—বাইরে মাথা কামড়াচ্ছে, সে আবার কি?

ততক্ষণে ঘটোৎকচ ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সকলে মিলে তখন তার মস্তক পরীক্ষায় লাগা গেল, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতরে বাঘ কি ভালুক কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। ছারপোকারাও ছিল অনেক দিনের উপোসী—ছাড়া পেয়ে তারা আত্মহারা হয়ে কামড়াচ্ছিল।

গোলমাল শুনে হেডমাস্টার মশাই এলেন, সমস্ত ক্লাশ ছেড়ে ছেলেরা ছুটে এল। হট্টগোলে সেদিন ইস্কুল গেল ভেঙে, কিন্তু ঘটোৎকচের লম্ফ-ঝম্প দেখে কে! ডাক্তার এলেন, কিন্তু তিনিও এই নতুন ধরনের মাথা-ব্যথার কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না।

অবশেষে এল নাপিত। কিন্তু মাথা মুড়োতে ঘটোৎকচ ভয়ানক নারাজ, তার অমন সাধের চুল—বোধ হয় ছারপোকার পরেই সে ভালোবাসে চুলকে। কিন্তু চুল না গেলে প্রাণ যায়, তাই অগত্যা ন্যাড়া হতে হল।

পরদিন ঘটোৎকচকে আর চেনাই যায় না। চুলের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ তার চলে গেছে। সে আর মুখও চালায় না, হাতও না। শান্ত, শিষ্ট, গম্ভীর গোবেচারা—একেবারে আলাদা লোক। চুলের সঙ্গে সঙ্গে যেন তার মাথা কাটা গেছল।

ছারপোকার নাড়ী-নক্ষত্র সব সে জানতো, কিন্তু তবু একটা বিষয় তার জানা ছিল না। ওরা বিশ্বাসঘাতক—যে আশ্রয় দেয়, এমন কি যে ভালোবাসে তাকেও ওরা কামড়ায়, তারও সর্বনাশ ওরা করতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র ইতস্ততঃ কি বিবেচনা ওদের নেই,—এটা সে আগে জানতো না। তাই ওদের এই ব্যবহারে ওর হৃদয়ে লেগেছিল। আর হৃদয়ে আঘাত লাগলে মানুষের এমনি হয়।

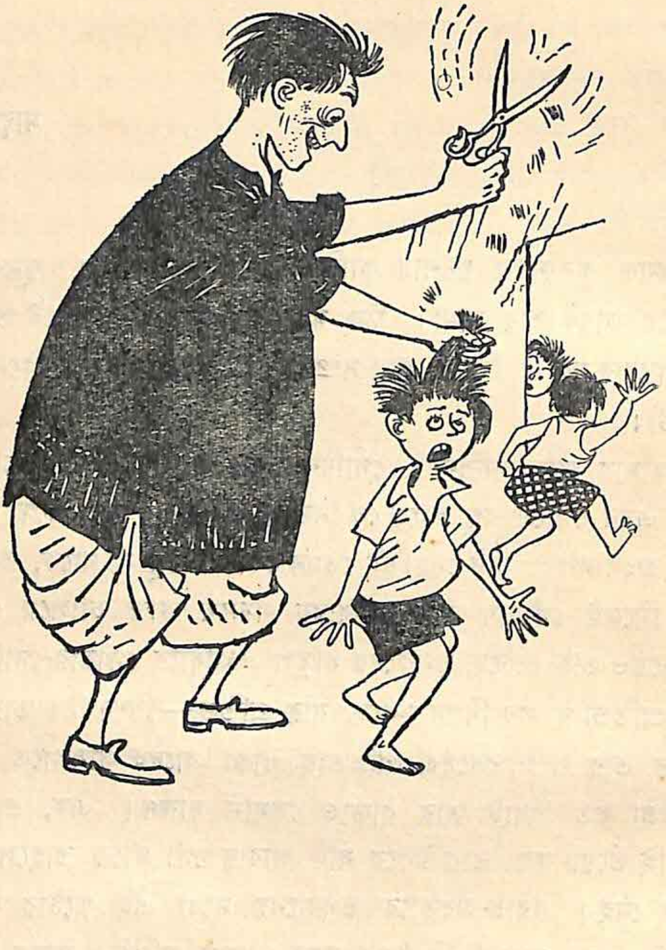
মাতুলতা

আজ ঝুনকুদের দুর্দশার কাহিনী তোমাদের বলব। ঝুনকুদের দুর্দশার কারণ তার মামা। ঠিক মামা নয়, মামার প্রতিভাই তাদের দুর্বিপাকের মূল। কিংবা মামা সম্প্রতি যে সেলাইয়ের কল কিনেছেন, সেইটা।

মামার নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ নাম হলেই তোমরা দেখবে তার এমন কোনো বন্ধু আছে যে নিতান্ত গোঁয়ার—যার সঙ্গে মিলে তার দ্বন্দ্বসমাস। যদি নেহাতই তেমন কোনো বন্ধু না থাকে, তাহলে সে নিজেই গোঁয়ার হয়ে কর্মধারয় সমাসে কাজ চালিয়ে নেয়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, ঝুনকুদের মাতুল একাধারে গোঁয়ার-গোবিন্দ।

প্রতিভা থাকার বিপদ আছে, যার প্রতিভা—বিপদ ঠিক তার নয়, বিপদ তার পরিবারবর্গের, প্রতিভার ধাক্কা যাদের সামলাতে হয়। প্রতিভা যত বিরাট তার ধাক্কাও তেমনি দারুণ! এক, প্রতিভা থাকাই ভয়ের কথা, তার উপরে যদি আবার গোঁ থাকে তাহলে আর রক্ষে নেই। বরাহ-অবতারে ভগবানের মধ্যে এই দুটোর সমন্বয় ঘটেছিল, যার ফলে তিনি দাঁতে করে জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার সাধন করেছিলেন। আজকালকার গোঁ-শীল প্রতিভারাও গুঁতোর চোটে পৃথিবীকে ঊর্ধ্ব-মার্গে তুলতে চান।

যেমন ঝুনকুদের মামা। অবশ্য তাঁর প্রতিভা ও গোঁ এখনো পৃথিবী-ব্যাপক হয়নি, কিন্তু হতে কতক্ষণ? ছোট বীজ থেকেই তো



—বড় হয়নি কি রে? ·· ···তালগাছ হবে না কি? পৃষ্ঠা ৫৯

বনস্পতি চারিদিকে ডালপালা ছড়ায় ? কিন্তু পৃথিবীর দিকে মামার প্রতিভাটা ছড়িয়ে পড়লে ঝুনকুরা আশ্বস্ত হয়,—যদিও তাতে বাঁচন নেই, তবু সবাই চারিয়ে মার খেলে লাগে কম। এমন কি, ভালোই লাগে।

প্রতিভার লক্ষণ কি কি, বলতে পারো ? প্রথমত, সে হবে পায়োনীয়ার—একটা বিশিষ্ট পথের অগ্রদূত। দ্বিতীয়ত, সে হবে ওরিজিনাল—তার সাধনার ধারায় থাকবে মৌলিকতা। তৃতীয়ত, তাকে পাগল বলে আর সকলের সন্দেহ হবে। বলা বাহুল্য, এই সন্দেহ-সূচক লক্ষণটি তার আশেপাশের লোকেদের মধ্যেই প্রকাশ পাবে, তার নিজের মনে এমন কোনো সন্দেহ থাকবে না। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে গোবিন্দ যে বিলক্ষণ প্রতিভার অধিকারী তার পরিচয় সে বাল্যকাল থেকেই দিচ্ছে।

গোবিন্দ তখন নিতান্ত বালক, তার বৌদির বাপের বাড়ি থেকে তত্ত্ব এলো। মা যখন তত্ত্ববাহক ও বাহিকাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যস্ত এবং তার সমালোচনা যখন ক্রমশই কঠোর হয়ে উঠছে, সেই অবসরে গোবিন্দ তার থেকে সব রকম খাদ্য-সামগ্রীর কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করে একেবারে ছাদে গিয়ে হাজির। মা সেটা লক্ষ্য করেছিলেন, গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন—খাবারগুলো কেমন দিয়েছে রে ? পচা বোধ হয় !

ততক্ষণে গোবিন্দর পেটে গিয়ে হজম হয়ে সেগুলো পুরাতত্ত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সাগ্রহে উত্তর দিল—না মা, খুব ভালো !

নিমকহারামি বরং করা চলে, কিন্তু সন্দেশ-হারামি ? না, গোবিন্দর অত ছোট মন নয়। মা বললেন, হ্যাঁ, ভালো না ছাই !

—না মা, খুব চমৎকার! তুমি খেয়ে দেখো। কিন্তু ঐ যে লম্বা লম্বা, ভেতরে সুতোওলা, ওরও একটা খেলাম। খুব খারাপ নয়, তবে মিষ্টি একটু কম। চিনি দিয়ে খেতে হয়।

—য়্যাঁ? সর্বনাশ করেছে! ও খেলি কি রে? ও যে মোমবাতি!

—মোমবাতি? তা হোক, কিন্তু খেতে বেশ মা।

গোবিন্দ ছেলেবেলা থেকেই কেমন সপ্রতিভ, এই বৃত্তান্ত থেকেই তোমরা তার প্রমাণ পাবে। মাংসভুক, শস্যভুক, এমন কি বায়ুভুক পর্যন্ত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, কিন্তু মোমভুক, কোনো জীব ছিল না। ভাবীকালের অনাগত সেই মানুষদের গোবিন্দই হচ্ছে অগ্রদূত। কিন্তু কেবল অগ্রদৌত্যই নয়, গোবিন্দর বিশিষ্ট চিন্তাধারার পরিচয় ছেলেবেলাতেই পাওয়া গেছল।

জিওগ্রাফির একটা প্রশ্ন ছিল—কি করিয়া দিন এবং রাত্রি হয়, উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়া বল।

পরীক্ষার খাতায় গোবিন্দ লিখল, 'যখন বাঘাটা কানের কাছে এসে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে এবং আমি বাঁ চোখটা আধখানা খুলে দেখি টেবিলের উপর চা আর বিস্কুট রয়েছে, তখন বুঝতে পারি দিন হয়েছে। আর যখন আমরা লাট্টু ঘুরিয়ে বাড়ি ফিরি তখন রাত্রি হয়।'

পরীক্ষক মশাই এই মৌলিক গবেষণার মর্ম বুঝতে না পেরে খাতার উপরে লাল পেনসিলে লিখে দিয়েছিলেন—M A D। সব বিষয়ে প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর এমনি মূল্যবান হওয়ার ফলে গোবিন্দর সে-যাত্রা আর প্রোমোশন হল না। পৃথিবীতে প্রকৃত প্রতিভাবানকে ক'জন বোঝে?

বাবা দূরদেশে চাকরি করতেন। সেখান থেকে গোবিন্দকে লিখলেন, পাস করেছিস তো?

গোবিন্দ সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে চিঠিতে একটা ছবি এঁকে পাঠিয়ে দিল। এবং পাছে ছবিটা বুঝতে বাবার অস্থুবিধা হয়, এইজন্য তার নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিল—হাতি আঁকিলাম।

মানে গোবিন্দ হয়তো বলতে চেয়েছিল—পাস করেছি না হাতি। প্রতিভাবান লোকেরাই এমন স্পষ্টবক্তা হয়!

এ সব ইতিহাস তার ছোটবেলার—এখন ঝুনকুদের দুর্দশার কাহিনীতে আসা যাক। কিছুদিন আগে গোবিন্দর ধারণা হয়েছিল যে চুল ছাঁটার প্রতিভা তাঁর আছে। তারপরেই তিনি এক নাপিতের কাছ থেকে একখানা ভোঁতা কাঁচি যোগাড় করে ভাগনেদের মাথার দিকে মনোযোগ দিলেন। চুল বড় হোক আর না হোক, তাঁর যদি সন্দেহ হয় যে কারো চুল বড় হয়েছে, অমনি তিনি তাকে ধরে চুল ছেঁটে দেবেনই! এমনি কায়দার তাঁর চুল ছাঁটা যে দু পাশ কিছুতেই সমান হবে না, মাঝে মাঝে খপচানো থাকবে, এমনো হতে পারে যে সামনের দিক খুব ছোট হয়ে গেল পেছন দিকের তুলনায়! মামার দৃষ্টি এড়িয়ে ভাগনেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কিন্তু মামা দেখতে পেলেই ধরে বলেন—আয়, তোর চুল ছেঁটে দি!

—এই সেদিন কাটলাম যে, এখনো বড় হয়নি মামা!

—বড় হয়নি কি রে? আর কত বড় হবে? তালগাছ হবে না কি?

যদি কেউ বাইরে নাপিতের কাছে চুল ছাঁটিয়ে আসে, মামা একবার তাকালেই তা টের পাবেন। না, এ তো তাঁর ছাঁটা নয়, তাঁর ছাঁটা কখনো এত খারাপ, এমন বিশেষত্বহীন হতে পারে না! অমনি সেই চুলকে দুরস্ত করতে তিনি পুনরায় কাঁচি ধরবেন! মানে, কিছুতেই মাথা বাঁচানোর উপায় নেই!

মাথার উপর অত্যাচার তো আছেই, তার উপর গোবিন্দ সম্প্রতি একটা সেলাইয়ের কল কিনেছেন। পোশাক তৈরি ব্যাপারেও নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দেবেন, আপাতত এই তাঁর বাসনা। বাজারের তৈরী সমস্ত জামা বাতিল করে তিনি নিজে ঝুনকুদের সার্ট-পাঞ্জাবি-সৃষ্টিতে মন দিয়েছেন। প্রতিভার দস্তুরই এই যে, সে সর্বদা নতুন পথ কেটে চলে।

সৃজন-প্রতিভা জিনিসটাই মারাত্মক, বিশেষ করে খাবার-দাবার আর পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে। মামার তৈরী জামা পরতে ঝুনকুদের কান্না পায়। তাদের ক্লাশের ছেলেরা হাসে, জিজ্ঞাসা করে—কোন দোকানের ভাই? দোকানের নাম তো করতেই পারে না, মামার তৈরী বলতেও তাদের লজ্জায় বাধে।

সে-সব জামার অদ্ভুত ছিরি, অদ্ভুত ছাঁদ! কোনোটা বা সার্টের হাতা, পাঞ্জাবির ঝুল—কোনোটা পাঞ্জাবির হাতা, সার্টের ঝুল। কোনোটার বা ডান-দিকের চেয়ে বাঁ-দিকটা বেশী ঝোলা। কোনোটাতে হাত গলানো যায় না, কোনোটাতে মাথা গলানোই মুশকিল! কোনোটার আবার ঘের এত কম যে, দস্তুরমতো মারামারি করে পরতে হয়! তার উপরে বোতামের ছেঁদাগুলো এত ছোট ছোট যে বোতাম আঁটাই এক ধস্তাধস্তি ব্যাপার!

একদিন ঝুনকুর দিদিমা গোবিন্দকে ডেকে বললেন, আমার তাকিয়ার একটা খোল করে দিয়েছিস, বেশ করেছিস! তেলের চিটেয় তাকিয়াটা যেতে বসেছিল। কিন্তু বাছা, খোলের আবার বোতাম কেন, আর তার হাতাই বা কিসের! আমরা সেকেলে বুড়োমানুষ, জানিনে, বোধ হয় আজকালকার একটা ফ্যাসান?

—তোমার তাকিয়ার খোল? কই আমি তো করিনি। দেখি

দিকি! ···ওমা! এযে টুনকুর পাঞ্জাবি! পাজিটা তাকিয়ায় পরিয়ে গেছে! আচ্ছা, দেখছি হতভাগাকে!

বিনকু এসে অভিযোগ করল—মামা, আমার হাতের চেয়ে জামার হাত যে বড়!

ঝুনকু বলল, আমার আবার ডান হাতটা বাঁ হাতের চেয়ে লম্বা!

গোবিন্দ গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—নে নে, এখন হাতা গুটিয়ে পর। চিরকাল কিছু এমনি ছোটো থাকবিনে, বাড়বি তো? বড় হলে তখন ঠিক হয়ে যাবে।

কি করে, বেচারারা হাত গুটিয়ে পরে। একথা সত্যি, মাথায় বড় হলে হাতও নিশ্চয় কিছু পরিমাণে বাড়বে, কিন্তু ততদিনের অপেক্ষায় এই জামা টিকে থাকবে কি না বলা শক্ত। আর তাছাড়া ডান হাত কখনো বাঁ হাতের চেয়ে বেশী লম্বা হবে কি না সন্দেহ!

ঝুনকু, বিনকু, টুনকু—তিন ভায়ের মধ্যে টুনকুই সব চেয়ে ছোট। মামা যখন বাড়ি থাকে না, টুনকু সেলাইয়ের কল নিয়ে বসে। কলটা বেশ, চালাতে ভারি আরাম, আর কেমন আপনা-আপনি সেলাই হয়ে যায়। সে এক মজা!

টুনকু বোধ হয় মামার প্রতিভার অংশ পেয়েছিল, সে টম, পুষিদের জন্য জামা তৈরি করে—এমন কি চার-পা-ওলা পেণ্টুলুন পর্যন্ত। কিন্তু দেখা গেছে পোশাক পরতে তাদেরো খুব অভিরুচি নেই।

একদিন গোবিন্দ চমৎকার একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর একখানা দিশী কাপড় কিনে আনলেন। সমস্ত দিন ধরে কাপড়টা কুঁচিয়ে পাট করে রেখে মাকে ডেকে বললেন, আজ আর রাত্রে খাব না মা! আমাদের হারাধনের বিয়ে। আজ বরযাত্রী যাব। ঝুনকু, বিনকু, টুনকু—আমার জামা-কাপড় আলনায় রইল, খবরদার কেউ হাত দিবিনে। সাবধান!

গোবিন্দ বেরিয়ে যেতেই টুনকু বলল, আয় দাদা, মামার জামাটা সেলাই করে দিই।

—সেলাই করবি কি, ও-যে সেলাই-করা।

—আরো ভালো করে সেলাই করি।

—না না, মামা বকবে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে গা ধুয়ে কোঁচানো কাপড়টি পরে, হিমানী মেখে, চুলটুল আঁচড়ে, জামা পরতে গিয়ে গোবিন্দ দেখেন, জামার ভেতর দিয়ে হাত আর ঢোকে না। জোর করে গলাতে গিয়ে বগলের তলা ফেঁসে হাত বেরিয়ে পড়ল! জামার জোড়ের মুখগুলো কে সেলাই করে রেখেছে।

দারুণ ক্রোধে গোবিন্দর ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল, তিনি চীৎকার করে বললেন, এ কীর্তি কার?

'কীর্তির্যস্য স জীবতি' বলে একটা কথা আছে, আরেকটা কথা আছে 'স জীবতি যঃ পলায়তে'। সুতরাং বলা বাহুল্য টুনকুর টিকি দেখা গেল না! সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঝুনকুর এবং বিনকুরও। এদিকে হারাধন ট্যাক্সি করে এসে নীচে থেকে ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে। গোবিন্দর তখন কাঁদবার অবস্থা! বিয়ে বাড়ির অত স্ফূর্তি; অমন খাওয়া-দাওয়া! তার উপর এমন সিল্কের পাঞ্জাবিটা!

জানালা থেকে গলা বাড়িয়ে গোবিন্দ বলল, ভাই হারাধন! আমাকে আজ মাপ কর! হঠাৎ কেমন আমার গা-টা জড়াচ্ছে! তোমার বৌ-ভাতে কিন্তু ঠিক যাব ভাই।

সেলাইয়ের কলটা বৌ-ভাতের উপহারে দিয়ে দেবে গোবিন্দ মনে মনে স্থির করল।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ কাহিনী

দেশবিদেশ বেড়াতে তোমরা সকলেই খুব ভালোবাসো। সব ছেলেই ভালোবাসে। কিন্তু আমাদের শ্রীকান্তর ভ্রমণে আনন্দ নেই, তার কাছে ভ্রমণের মানেই হচ্ছে দেড় মণ।

তার মামা ভারি কৃপণ—কোথাও যেতে হলে গোটা বাড়িখানাই সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। কি জানি, বিদেশে কোনো জিনিসের দরকার পড়লে যদি সেটা আবার পয়সা খরচ করে কিনতে হয়! কিন্তু শ্রীকান্তর এদিকে প্রাণ যায়; সেই বিরাট লটবহর তাকেই বইতে হয় কি না! সে-সব মালপত্র গাড়িতে তুলতেও শ্রীকান্ত, গাড়ি থেকে নামাতেও শ্রীকান্ত, স্টেশনে যে কুলী নামক একজাতীয় জীবের অস্তিত্ব আছে, একথা শ্রীকান্তকে দেখলে তার মামা একদম ভুলে যান।

কেবল কুলীর কাজ করেই কি নিষ্কৃতি আছে? তাকে সমস্ত রাস্তা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় গাড়ির দরজায় মুখ গলিয়ে। কেন না তার মামার ধারণা, ওই ভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলে সে-কামরার দিকে কেউ এগোয় না। এবং যে-কামরার দিকে কেউ এগোয় সেদিকে কেবল একজন নয়, সেই স্টেশনের যত ভম্বলদাস সবাই সেই কামরার দিকে ঝুঁকে পড়ে—তা তার মধ্যে জায়গা থাক বা না থাক। কিছু দূরে খালি কামরা থাকলেও সেদিকে তাদের যেন দৃষ্টি পড়ে না।

তার মামা আবার পারতপক্ষে মেল-গাড়িতে যান না, প্যাসেঞ্জার-গাড়ি পেলে। যা দু-চার পয়সা বাঁচে। সময়ের আর কি মূল্য



শ্রীকান্ত, ট্রাঙ্কটা মাথায় নে, ··· বাঁ হাতে লণ্ঠন দুটো ঝুলিয়ে নিস,··· পৃষ্ঠা ৬৭

আছে বল? দু-ঘণ্টা পরে পৌঁছলে যদি দুটো পয়সা বাঁচে, তারই মূল্য। প্যাসেঞ্জার গাড়ি সমস্ত স্টেশন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়—দু-তিন মিনিট অন্তর স্টেশন—কাজেই একটুখানি বসতে না বসতে আবার গিয়ে দরজায় দাঁড়াতে হয়। রাত্রেও ছাড়ান নেই—কেন না তখন যাতে কামরাতে স্থান-বাহুল্য না কমে, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হয়। তার মামা আয়েশী লোক, সারা রাত তিনি গাড়িতেও বাড়ির মতো আরাম চান—তখন যদি অনাহুত কেউ এসে তাঁর জায়গা জুড়ে বসবার জন্য তাঁর ঘুম ভাঙাতে চায়, তাহলে যে কি দুর্ঘটনাই ঘটে তা শ্রীকান্ত ভেবে পায় না। কাজেই রিজার্ভ-কামরার নোটিস বোর্ডের মতো তাকে গাড়ির দরজায় লটকে থাকতে হয়।

এই সব নানা কারণে ভ্রমণে শ্রীকান্তর সুখ নেই, সখও নেই। কিন্তু না চাইলেও অনেক জিনিস আপনি আসে। হাম হোক, কে আর চায়? কিন্তু হামেশাই তা হচ্ছে। ফেল হতে আর কোন ছেলের বাসনা, তবু কাউকে কাউকে ফেল হতে হয়। তেমনি শ্রীকান্তকেও মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে যেতে হয়।

যেমন আজ তাকে যেতে হচ্ছে। ছ্যাকরা গাড়ির ছাদে যা জিনিস ধরে তার দ্বিগুণ চাপানো হয়েছে, গাড়ির মধ্যে শ্রীকান্ত, তার মামা এবং মামী, আর মামাতো বোন টেঁপি। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে গাড়ির মধ্যে জিনিসেরও কমতি নেই,—জলের কুঁজো, হ্যারিকেন লণ্ঠন, হাতব্যাগ, ছাতা, পানের ডিবে, খাবারের চাঙ্গারি, টুকরো-টাকরা কত কি? কিন্তু এগুলোর জন্য শ্রীকান্তর ভাবনা নেই, কেন না এসব টেঁপির ভার—পানের ডিবে মামীমা সামলাবেন আর খাবারের চাঙ্গারি মামা। কিন্তু গাড়ির ছাদে বাক্স-তোরঙ্গ, বিছানার লাগেজ আর কাপড়চোপড়ের বিপুল-কায় সুটকেস—ওসব এখন থেকেই যেন শ্রীকান্তর ঘাড়ে চেপে বসেছে।

শিয়ালদহ পৌঁছেই মামা সর্বাগ্রে নামলেন। নেমেই বললেন, ওগো হাতপাখাটা দাও তো! শ্রীকান্ত, মোটঘাট সব নামা। ও বাপু কোচম্যান, তুমি একটু ধর, বুঝলে? আমি টিকিটগুলো কেটে আনি।

গাড়ি দাঁড়াতেই জনকতক কুলী এসে জুটেছিল, তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাল নামাতে গেল। মামা টিকিট করতে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু কুলীদের এই অযাচিত কর্মস্পৃহা দেখে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। বাধা দিয়ে বললেন, কি, তোমরা মাল নামাবে না কি? আবদার তো কম নয়! কেন, আমাদের কি হাত নেই?

একজন কুলী শ্রীকান্তর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, ওই ছোট ছেলে, ওকি পারবে বাবু?

কেন পারবে না শুনি? ওদের বয়সে আমরা লোহা হজম করেছি। শ্রীকান্ত, সব চটপট নাবিয়ে ফেল, ও ব্যাটাদের ছুঁতে দিসনে। যাও, যাও, তোমরা সব যাও।

বলে যেভাবে মাছি তাড়ায় সেইভাবে কুলীদের তাড়াবার একটা চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা নড়ল না দেখে বললেন, দেখ বাপু, মালে হাত দিও না, পয়সা পাবে না আগেই বলে দিচ্ছি।

এই কথা বলে তিনি টিকিট কিনতে চলে গেলেন। শ্রীকান্তর ইচ্ছা হল একবার বলে যে লোহা হজম করা যদিবা সম্ভব হয়, সেই লোহা বহন করা তত সহজ নয়। কিন্তু বলেই বা কি লাভ, সমালোচনা করলে তো লোহার ওজন কমবে না—এই ভেবে সে আস্তে আস্তে বাক্স-পেঁটরা, বাসনের ছালা, বিছানার লাগেজ, সুটকেস, মায় জলের কুঁজোটি পর্যন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে প্লাটফর্মের একাংশে স্তূপাকার করতে লাগল।

টিকিট কিনে মামা ছুটতে ছুটতে ফিরলেন—বললেন, গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই রে, সাত-আট মিনিট বাকি। শ্রীকান্ত, এই সামান্য

ক'টা জিনিস প্লাটফর্মে নিতে তোর কবার লাগবে ? বার তিনেক, বোধ হয় ? বার তিনেক হলে ফি বারে দু মিনিট—মোট ছ মিনিট, বাড়তি থাকে আরো দু মিনিট, খুব গাড়ি ধরা যাবে। টেঁপি, তুই এখানে দাঁড়িয়ে মালপত্রগুলো আগলা, শেষবারে শ্রীকান্তর সঙ্গে আসবি। আমি আর তোর মা এগোলাম। একটা খালি দেখে কামরা দেখতে হবে তো। শ্রীকান্ত, তুই ট্রাঙ্কটা মাথায় নে, তার উপরে ছোট স্যুটকেসটা চাপিয়ে দিচ্ছি, পারবি তো ? বিছানার লাগেজটা বাঁ বগলে নে, আর ডান হাতে বড় স্যুটকেসটা। বাঁ হাতে লণ্ঠন দুটো ঝুলিয়ে নিস, তাহলেই হবে। দ্বিতীয় বারে বাসন-কোসনের থলেটা আর তোর মামীর তোরঙ্গটা নিবি। দৌড়ে যাবি আর দৌড়ে আসবি—নইলে গাড়ি ফেল হবে, বুঝেছিস ? আমি এগোই ততক্ষণ।

তিনি তো এগোলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দেখেন শ্রীকান্তর দেখা নেই। তিনি আশা করেছিলেন যে শ্রীকান্ত তাঁর পিছু পিছু দৌড়চ্ছে, তাকে দেখতে না পেয়ে তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। ফিরে এসে দেখেন, শ্রীকান্ত মালপত্রের বোঝা নিয়ে একেবারে যেন চিত্র-পুত্তলিকা !

—কি রে, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে ? গাড়ি ফেল করবি না কি ?

—কি করব আমি, এগোতে পাচ্ছি না যে। বড্ড ভারি হয়েছে মামা। টেঁপিকে বললাম তুই পেছন থেকে ঠেলে ঠেলে দে, আমি চলতে থাকি, তা ও—

—বারে ! বাবা আমায় এখানে জিনিস আগলাতে বলল না ? আমি ওকে ঠেলতে ঠেলতে যাই আর এদিকে সব চুরি হয়ে যাক। তোমার আর কি, জিনিস কমে গেলে তোমাকে তো বইতে হবে না !

মামা বললেন, তাই তো, ভারি মুশকিল হল দেখছি।

একটা কুলী এবার সাহসভরে এগিয়ে এসে বলল, খোকাবাবু সেক্‌বে কেন? সোব ফেলে ভেঙে চুরমার হোবে। আর ইদিকে টিরেনভি ছেড়ে দিবে।

তাই তো! ভারি মুশকিল!

কুলী করলে তো নগদ লোকসান, এদিকে জিনিস ফেলে ভাঙলেও ক্ষতি, গাড়িরও সময় নেই—কিন্তু ভাববার আর সময় কই? কাজেই বাধ্য হয়ে মামাকে ছুটো কুলী করতে হল। আধঘন্টা আগে বেরুলে এই অপব্যয়টা হত না, শ্রীকান্তই পাঁচ-ছবারে কম কম করে গাড়িতে মালগুলো তুলতে পারত? যাকগে, আর উপায় কি?

অতঃপর একটা দেখবার মতো দৃশ্য হল। ছুটো কুলী আগে আগে, তাদের মাথায় ছুটো বড় বড় তোরঙ্গ। এক জনের বগলে বিছানার লাগেজ, আরেক জনের বগলে বাসনের থলে। মামী নিয়েছেন জলের কুঁজো আর টেঁপি নিয়েছে পানের বাটা। মামার এক হাতে একটা ছোট হাতব্যাগ, অন্য হাতে তালপাখা—তারই ভারে মামা কাতর; এতটা ঘেমে উঠেছেন যে, ওরই ফাঁকে তালপাতার হাওয়া খেতে হচ্ছে।

সব শেষে চলেছে শ্রীকান্ত—একেবারে কুঁজো হয়ে। বাড়তি ট্রাঙ্কটা তারই ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। শোভাযাত্রাটা দেখবার মতো।

গাড়িতে উঠেই মামা লম্বা করে বিছানা পেতে ফেললেন। এতক্ষণ গুরুতর পরিশ্রম গেছে, সেজন্য যথেষ্ট বিশ্রাম দরকার। চলন্ত গাড়ির ফাঁকা হাওয়া গায়ে লাগতেই তিনি আরামে চক্ষু বুজে বললেন, আঃ, এতক্ষণে দেহটা জুড়োল। সমস্ত গাড়ি-ভর্তি, কিন্তু এ কামরাটা খুব খালি পাওয়া গেছে; কারু চোখে পড়েনি বোধ হয়।

বিচিত্র লটবহরে ওই ছোট কামরার প্রায় সমস্তটাই ভরে গেছল, তারই একধারে বসে শ্রীকান্ত তার পীড়িত ঘাড়ের শুশ্রূষা করছিল। তার অবস্থাটা বুঝে মামী বললেন, বড্ড লেগেছে না কি রে?

অপ্রতিভ হয়ে শ্রীকান্ত ঘাড়ে হাত বুলানো বন্ধ করল—না, মামীমা।

মামা বললেন, ওয়েট লিফটিং একটা ভালো এক্সারসাইজ। এতে ওর ঘাড় শক্ত হবে। ওটা দরকার।

মামী বললেন, তোমার যেমন! যাচ্ছি তো ক'দিনের জন্য বেড়াতে, বিয়ের নেমন্তন্নে। এত মালপত্র নিয়ে বেরুনো কেন? কি কাজে লাগবে এসব?

মামা বললেন, যাকে রাখ সেই রাখে, কথাটা জানো তো? সব জিনিসই কাজে লাগে, কাজের সময় তখন পাওয়া না গেলেই মুশকিল।

মামী বললেন, মদনপুরে গাড়ি তো দাঁড়ায় মোটে এক মিনিট। বোধ হয় এক মিনিটও দাঁড়ায় না। তার মধ্যে কি এই লটবহর নামানো যাবে? দেখো, তখন কি ফ্যাসাদে পড়। বাক্স-পেঁটরা সব গাড়িতেই থেকে যাবে দেখছি।

মামা বললেন, কি জানো গিন্নী, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। কিছু ভেব না তুমি।

মামার কথায় শ্রীকান্তর হৃৎকম্প হল, কেন না মদনপুর স্টেশনে, যেখানে এক মিনিট মাত্র গাড়ি থামে কিংবা তাও থামে না, সেখানে ভগবানের জায়গায় নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই সে কল্পনা করতে পারল না। এই বিরাট এবং বিচিত্র লটবহর তাকেই গাড়ি থেকে নামাতে হবে। তাহলেই তো সে গেছে, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—শ্রীকান্তর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

দমদমে গাড়ি দাঁড়াতেই জনকত কৃষ্ণকায় ফিরিঙ্গী যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। মামার এবং মালপত্রের বহর দেখে তারা একেবারে হতভম্ব। অবশেষে তাদের একজন ভাঙা বাংলায় মামাকে বলল, টোমরা এ গাড়িতে কেন বাবু? এটা সাহেবডের জন্য—দরজায় নোটিস দেখ নাই, 'for Europeans only'. টোমাডের নামটে হবে।

সবেমাত্র আয়েশ করছেন, নামার কথায় মামার মাথা গরম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, কেনো নামটে যাব? আমরাও টোমাডের মটই খাঁটি ইউরোপীয়ান, চাহিয়া ডেখ, টোমাডের ও আমাডের এক-প্রকার গায়ের রঙ।

—অল রাইট। ডেখি টোমরা নামিবে কি না? বলে তারা নেমে গেল এবং পরবর্তী স্টেশনে একজন রেল-কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে এল।

কর্মচারীটিও এসে নামতে অনুরোধ করলেন।

মামা বললেন, সমস্ত গাড়ী ভর্তি, কেবল এইটা খালি ছিল, কোথাও জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে আমরা এই কামরায় উঠেছি। অন্য কোথাও বা উঁচু ক্লাশে আমাদের জায়গা করে দিন, এখুনি আমরা নেমে যাচ্ছি।

'আচ্ছা দেখছি জায়গা' বলে কর্মচারীটি নেমে গেলেন, ফিরিঙ্গীরা গাড়িতেই রইল। শ্রীকান্তর ভয় হল, পাছে কর্মচারীটি অন্য কোথাও জায়গা খুঁজে পান, তাহলে তো এখুনি তাকে ভগবানের অবতার হয়ে এই লটবহর বওয়া-বওয়ি করতে হবে।

কিন্তু কর্মচারীটি আর ফিরলেন না, গাড়িও ছেড়ে দিল। কেবল ফিরিঙ্গীরা নিজেদের মধ্যে গজরাতে লাগল। মামা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। কিন্তু মামী বললেন, কাজ নেই বাপু, পরের স্টেশনে চল অন্য কামরায় যাই।

—হ্যাঃ, কোথাও খালি আছে না কি ?

—না থাকে, পরের গাড়িতে যাব না হয়।

—পাগল !

—যদি পুলিসে ধরে নিয়ে যায়। সাহেবদের গাড়ি যে !

—হ্যাঁ, ধরলেই হল! তুমি চুপ করে থাক, ব্যাটারা বাংলা বোঝে—তুমি ঘাবড়ে গেছ জানলে আরো লাফাবে।

অগত্যা মামী চুপ করলেন।

খানিক বাদেই বারাকপুর এল। গাড়ি দাঁড়াতেই ফিরিঙ্গীগুলো একজন সাহেব কর্মচারীকে ডেকে আনল। তিনি এসে বললেন, বাবু, টোমাডের নামিটে হইবে—যাহাডের সাহেবি ড্রেস, এ কামড়া কেবল তাহাডের জন্য !

মামা বললেন, তা, একথা আগে বলনি কেন সাহেব ? আমাডেরো সাহেবি পোশাক আছে। আমাদের সময় দাও, আমরা এখুনি পরে নিচ্ছি। ওগো, ট্রাঙ্কের চাবিটা দাও তো—

অগত্যা সাহেব কর্মচারীটি চলে গেল। মামার সত্যিই কিছু সাহেবি পোশাক ছিল না, একটা চাল মারলেন মাত্র, এদিকে গাড়িও বারাকপুর ছাড়ল।

অতঃপর ফিরিঙ্গীরা আর কোনো উপায় না দেখে এদের তাড়াবার ভার নিজেদের হাতে নিল। পরস্পর পরামর্শ করে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে মামী দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেলেন। মামারও যে একটু ভয় না হল এমন নয়। মামী বললেন, হ্যাঁ গা, কামড়ে দেবে না তো ?

মামা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বললেন, কি জানি !

কামড়াবার কথা শুনে টেঁপি একেবারে বাবার বিরাট পরিধির পেছনে এসে আশ্রয় নিল!

মামা বললেন, ভালো ফন্দি মাথায় এসেছে। শ্রীকান্ত তুই কুকুর ডাকতে পারিস?

—বেড়ালের ডাক খুব ভালো পারি মামা। ডাকব? ম্যা—

—না, না, বেড়াল ডাকতে হবে না। মাঝে মাঝে তুই কুকুরের মতো ডাক দিখি!

শ্রীকান্ত ডাকল—ঘেউ ঘেউ।

—আরো একটু জোরে।

—ঘেউ ঘেউ ঘেউউ।

হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে ফিরিঙ্গীরা চুপ করল। শ্রীকান্ত আবার ডাকল—ঘেউ ঘেউ ঘেউ—

একজন জিজ্ঞাসা করল, ও রোকম ডাকছে কেন সে? তার কি হোয়েছে?

মামা গম্ভীরভাবে বললেন, ও কিছু নয় সাহেব। দশ-বারো দিন হল ওকে পাগলা কুকুরে কামড়িয়েছে। Bitten by a mad dog—বুঝলে?

ফিরিঙ্গীরা যেন লাফিয়ে উঠল।—অ্যাঁ? হাইড্রোফোবিয়া! একথা আগে বল নাই কেন? ওটো কামড়াইটে পারে?

মামা বললেন, না না, কামড়াইবে না। ভয় নাই।

বলতে বলতে নৈহাটি এসে পড়ল। ফিরিঙ্গীরা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ হুড়মুড় করে সেই কামরা থেকে পিটটান দিল।

'যাক, বাঁচা গেল' বলে মামা যেই মাত্র না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন, অমনি আরেকজন ফিরিঙ্গী যুবক এসে সেই কামরায় উঠল। সে

কোনো উচ্চবাচ্য না করে এককোণে গিয়ে বসল, মামাদের দিকে তাকালও না। মামা বললেন, দাঁড়াও। তোমাকেও ভাগাচ্ছি পরের স্টেশনে। শ্রীকান্ত, গাড়ি ছাড়লেই—বুঝেছিস ?

যুবকটি ডিটেকটিভ নভেল বের করে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল, হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনে চমকে উঠে মামাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ওর ?

সাহেবের মুখে পরিষ্কার বাংলা শুনে মামা বাংলাতেই জবাব দিলেন—ও কিছু না, জলাতঙ্ক—যাকে তোমরা হাইড্রোফোবিয়া বল।

—ওঃ! তাই না কি ? ওতে ওর উপকার করবে।

বলে ছোকরা আবার বইয়ে মন দিল। তার নিশ্চিন্ত নির্বিকার ভাব দেখে মামার পিত্ত জ্বলে গেল। তবু তিনি বললেন, তোমাকে সাবধান করা আমার কর্তব্য। কি জানি, যদি কামড়ে দেয়, বলা তো যায় না। তখন তোমাকেও ঐ রোগে—

যুবকটি মৃদু হেসে বলল, আহা, না না! যে কুকুর ডাকে সে কি কামড়ায় ?

অগত্যা মামা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন এবং শ্রীকান্তও ডাক ছেড়ে দিল। তাকে কুকুর বলাতে সে মনে মনে এমনি চটেছিল যে, তার ইচ্ছা করছিল ফিরিঙ্গীটাকে এখুনি গিয়ে কামড়ে দেয়।

কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ি থামতেই যুবকটি মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখছিল। তার পরিচিত বন্ধুদের দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি শুরু করতেই সেই পুরাতন দল এসে উপস্থিত। তারা তাকে ঐ কামরায় দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি নিরাপদে আছ তো ? ওখানে যে মারাত্মক হাইড্রোফোবিয়া!

—সে আমি সারিয়ে দিয়েছি।

—সারিয়ে দিয়েছ কি রকম ?

তখন মামার চাল যুবকটি বন্ধুদের কাছে ফাঁস করে দিল—সে কামরায় ঢুকেই ছেলেটিকে জল খেতে দেখেছিল, জলাতঙ্ক রোগে যা কখনো সম্ভব নয়। তখন শ্রীকান্তর ভারি রাগ হল তার মামার উপর, জলাতঙ্ক রোগে জল খেতে নেই একথা কেন তাকে তিনি আগে বলেননি। তাইতো তাকে এমন অপদস্থ হতে হল!

এইবার ফিরিঙ্গীরা আবার সেই কামরায় জাঁকিয়ে বসল এবং স্পষ্ট ভাষায় মামাকে জানাল যে এবার তাঁকে নামতেই হবে এবং পরের স্টেশনেই।

অসহায়ভাবে মামী বললেন, ওগো, কি হবে তাহলে ?

মামা বললেন, কিছু ভেব না গিন্নী! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

ভগবানের নাম শুনে শ্রীকান্তর নিজেকে মনে পড়ল এবং ঘাড়ের ব্যথাটা এতক্ষণে কতটা মরেছে জানবার জন্য সে একবার ঘাড়টাকে খেলিয়ে নিল।

পরের স্টেশন আসতেই মামা বললেন, এখানে তো হয় না, পরের জংশনে না হয় বদলানো যাবে।

—না, টা হইবে না, এইখানেই টোমাকে নামিটে হইবে।

তখন তারা সবাই মিলে মামার বাক্স, তোরঙ্গ, বিছানা, সুটকেসএ হাত লাগাল।

—ডেখি, কেমন টুমি না নাম। এই বলে একজন বাসনের থলেটা নামিয়ে দিয়ে বলল—Here you are.

কুঁজোর জাত যাওয়ায় মামীমা হায় হায় করতে লাগলেন। ততক্ষণে দুজন মিলে ধরাধরি করে ভারি ট্রাঙ্কটা নামিয়ে ফেলেছে। মামা তখন

বাঙ্কের উপরের বড় স্যুটকেসটা ওদের দেখিয়ে দিলেন। একজন গিয়ে সেটা নামাল।

মামা বললেন, বেঞ্চির তলায় ঐ তোরঙ্গটা—ওই যে।

একজন সেটা নামিয়ে বলল, এই টোমার টুরঙ্গ।

মামা সংশোধন করে দিলেন—তুরঙ্গ নয়, তোরঙ্গ। সর্বশেষে বুদ্ধিমান যুবকটি ছোট হাতব্যাগটা মামাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, গুড-বাই, মিস্টার!

মামা এতক্ষণ পুলকিত হয়ে ওদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এইবার বললেন, এই মদনপুর—এখানেই আমরা নামতাম। অতএব গুড-বাই এবং থ্যাঙ্কস।

মণ্টুর মাস্টার

বি.এ. পাস করে বসে আছে মিহির, কি করবে কিছুই স্থির নেই। এমন সময়ে দৈনিক আনন্দবাজারে একটা বিজ্ঞাপন দেখল কর্মখালির। কোনো বনেদী গৃহস্থের একমাত্র পুত্রের জন্য একজন বি. এ. পাস গৃহশিক্ষক চাই—আহার ও বাসস্থান দেওয়া হবে, তাছাড়া বেতন মাসিক ত্রিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনটা পড়েই লাফিয়ে উঠল মিহির, এই রকমই একটা সুযোগ খুঁজছিল সে। খাওয়া-থাকাটা অমনিই হবে, তাছাড়া ত্রিশ টাকা মাসে—কিছু কিছু বাড়িতেও পাঠাতে পারব, এম. এ-টাও পড়া হবে সেই সঙ্গে, সিনেমা ফুটবল-ম্যাচ দেখার মতো পকেট-খরচারও অভাব হবে না।

একবার তার মনে হল এই বিজ্ঞাপনটা এর আগেও যেন সে দেখেছে আনন্দবাজারে। হ্যাঁ, প্রায়ই সে দেখেছে। গত বছরেও দেখেছে, তখনই তার ইচ্ছা হয়েছিল একটা আবেদন করে দেয়, কিন্তু তখনো সে বি.এ. পাস করেনি। খুব সম্ভব ছেলেটি একটি গবাকান্ত—তাই বেতন ভারি দেখে লোকে এগোলেও ছেলে আবার তার চেয়ে ভারি দেখে পিছিয়ে পড়ে।

সে কিন্তু পেছোবে না, প্রাণপণে পড়াবে ছেলেটাকে—পড়াতে গিয়ে যদি পাগল হয়ে যেতে হয় তবুও। ত্রিশ টাকা কম টাকা নয়—তার জন্য গাধা পিটিয়ে মানুষ করা আর বেশী কথা কি, মানুষ



আর্তনাদ করে মিহির লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। পৃষ্ঠা ৮৫

পিটিয়েও গাধা বানানো যায়। ভদ্রলোক অতগুলো টাকা কি মাগনা দিচ্ছেন ?

বিকেলেই মিহির সেই ঠিকানায় গেল। বি.এ-র সার্টিফিকেটটা সঙ্গেই নিয়ে গেছল কিন্তু ভদ্রলোক তা দেখতেও চাইলেন না, কেবল মিহিরকে পর্যবেক্ষণ করলেন আপাদমস্তক। মিহিরই যেন মিহিরের সার্টিফিকেট, মিহির খুশীই হল এতে।

অবশেষে ভদ্রলোক বললেন তোমার জামাটা একবার খোল তো ?

মিহির ইতস্তত করে। জামা খুলতে হবে কেন ? বুঝতে পারে না সে।

—আপত্তি আছে তোমার ?

—না, না। মিহির জামাটা খুলে ফেলে। ত্রিশ টাকার জন্য জামা খোলা কেন, যদি জামাই হতে হয় তাতেও সে রাজী।

—তুমি এক্সারসাইজ কর ?

—একটু আধটু।

—বেশ বেশ। ভদ্রলোককে একটু চিন্তান্বিত দেখা যায়। মিহির ভাবে, এক্সারসাইজ করার অপরাধে চাকরিটা খোয়াল না তো ? নাই বলতো কথাটা, কিন্তু কি করেই বা সে জানবে যে ভদ্রলোক এক্সারসাইজের উপর চটা। কিন্তু এও তো ভারি আশ্চর্য, সে গ্রাজুয়েট কি না, কোন বছরে পাস করেছে এসব কিছুই তিনি জিজ্ঞাসা করছেন না।

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব তোমায়।

মিহির পকেটের মধ্যে সার্টিফিকেটটা বাগিয়ে ধরে—এইবার বোধ হয় সেই প্রশ্ন আসবে! আর সে উত্তর দিয়ে চমৎকৃত করে দেবে যে বি.এ-তে সে ডিস্টিঙ্কশন পেয়েছে।

ভদ্রলোক মিহিরকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, তোমার শরীরটা নেহাৎ মন্দ নয়। ওজন কত তোমার!

ওজন? আকাশ থেকে পড়ে মিহির—অবশেষে কি না এই প্রশ্ন—তা দু মণের কাছাকাছি!

—বেশ বেশ। কিছুদিন টিকতে পারবে তুমি, আশা হয়। কি বলিস মণ্টু, তোর এ মাস্টার মশাই কিছুদিন টিকে যাবে, কি মনে হয় তোর?

মিহিরের ছাত্র কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সে সায় দিল—হ্যাঁ বাবা, এ মাস্টার মশায়ের গায়ে অনেক রক্ত আছে।

ভদ্রলোক অবশেষে তাঁর রায় প্রকাশ করলেন—কিছুদিন টেকা আশার কথা, বেশ কিছুদিন টেকাটাই হল আশঙ্কার। যাক, সবই ভগবানের হাত—

মণ্টু বাধা দিল—ভগবানের হাত নয় বাবা, ছার—

—চুপ। কথার উপর কথা ক'স কেন? কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হল না তোর। হ্যাঁ, দেখ বাপু, পড়াশুনার সঙ্গে এটিকেটও একে শেখাতে হবে। পিতামাতা গুরুজনদের কথার উপর কথা বলা, অতিরিক্ত হাসা—এই সব মহৎ দোষ এর সারাতে হবে। বেশ, আজ থেকেই ভর্তি হলে তুমি। ত্রিশ টাকাই বেতন হল, মাসের পয়লা তারিখেই মাইনে পাবে, কিন্তু একটা শর্ত আছে। পুরো এক মাস না পড়ালে, এমন কি একদিন কম হলেও একটা টাকাও পাবে না তুমি। পাঁচ দিন দশ দিন পড়িয়ে অনেক প্রাইভেট টিউটার ছেড়ে চলে গেছে, সে-রকম হলে আমি বেতন দিতে পারি না, সে-কথা আমি আগেই বলে রাখছি—

মণ্টু বলল, একজন কেবল বাবা ঊনত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিলেন—আরেকটা দিন যদি কোনো রকমে থাকতে পারতেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

—থাম তুই। তা তোমার জিনিসপত্র সব নিয়ে এসোগে। আজ সন্ধ্যা থেকেই ওকে পড়াবে। মণ্টু, যা, মাস্টার মশায়ের ঘরটা দেখিয়ে দে, আর ছোট্টুরামকে বলে দে বেতন-নিবারকে মাস্টার মশায়ের বিছানা পেড়ে দিতে।

আগাগোড়াই অদ্ভুত ঠেকছিল মিহিরের, কিন্তু ত্রিশ টাকা—এক সঙ্গে ত্রিশ টাকা মাসের পয়লা তারিখে পাওয়াটাও কম বিস্ময়ের নয়। চিরকাল মাস গেলে টাকা দিয়েই সে এসেছে—কলেজের টাকা, মেসের টাকা, খবরের কাগজওয়ালার টাকা; এই প্রথম সে মাস গেলে নিজে টাকা পাবে। এই অনির্বচনীয় বিস্ময়ের প্রত্যাশায় ছোটখাট বিস্ময়গুলো সে গা থেকে ঝেড়ে ফেলল।

সন্ধ্যার আগেই সে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরল। বেশ ঘরখানি দিয়েছে তাকে—ভারি পছন্দ হল তার। এমন সাজানো গোছানো ঘরে এর আগে সে থাকেনি কখনো। একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল—পুরানো হোক, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। একটা ছোট বুককেসও আছে—তার বইগুলো সাজিয়ে রাখল তাতে। আর একধারে পড়াশুনার টেবিল, তার দু পাশে দুটো চেয়ার—বুঝল, এই ঘরেই পড়াতে হবে মণ্টুকে। সব চেয়ে সে চমৎকৃত হল নিজের বিছানা দেখে।

ঘরের একধারে একখানা খাট, তাতেই তার শোবার বিছানা। চমৎকার গদি-দেওয়া, তার উপরে তোশক, তার উপরে ধব ধব করছে সদ্য পাট-ভাঙা বোম্বাই চাদর। ভারি ভদ্রলোক এরা,—না, কেবল ভদ্র বললে এদের অপমান করা হয়, যথার্থই এরা মহৎ লোক।

সত্যিই খাটে শোবার কল্পনা তার ছিল না। জীবনে কখনো সে গদিমোড়া খাটে শোয়নি। আনন্দের আতিশয্যে সে তখনই একবার গড়িয়ে নিল বিছানায়। আঃ, কি নরম! আজ খুব আরামে ঘুমানো যাবে—খেয়ে দেয়ে সে তো এসেছেই, আজ আর কোনো কাজ নয়, এমন কি মণ্টুকে পড়ানোও না, আজ কেবল ঘুম! তোফা একটা ঘুম বেলা আটটা পর্যন্ত!

মণ্টু এল বই-পত্র নিয়ে। মিহির প্রস্তাব করল, এসো, খাটে বসেই পড়াই।

—না সার্, আমি ও-খাটে বসব না!

মিহির বিস্মিত হল—কেন?

—আপনি মাস্টার মশাই গুরুজন, আপনার বিছানায় কি পা ঠেকাতে আছে আমার? বাবা বারণ করেছেন।

—ওঃ তাই! তা চল, চেয়ারেই বসিগে। ক্ষুণ্ণ মনে সে চেয়ারে গিয়ে বসল—কিন্তু যাই বল, বেশ বিছানাটি তোমাদের। ভারি নরম। বেশ আরাম হবে ঘুমিয়ে।···দেখি তোমার বই।···Beans! ···বীন্স মানে জানো?

মণ্টু ঘাড় নাড়ে।

—Beans মানে বরবটি। বরবটি এক রকম সবজি—তরকারি হয়, আমরা খাই। Beans দিয়ে একটা সেনটেন্স কর দেখি। পারবে?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ। তারপর অনেক ভেবে বলে—I had been there.

মিহির অত্যন্ত অবাক হয়—এ আবার কি! উঃ, এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে কেন সব মাস্টার পালিয়ে যায়। গবাকান্ত বলে গবাকান্ত! মরিয়া হয়ে সে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে কি হল?

মণ্টুও কম বিস্মিত হয় না—তার মানে তো খুব সহজ! আপনি বুঝতে পারছেন না? সেখানে আমার বরবটি ছিল। আই হ্যাড বিন দেয়ার—আমার ছিল বরবটি সেখানে--সেইটাই ঘুরিয়ে ভালো বাংলায় হবে সেখানে আমার—।

—থাম থাম, আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না তোমায়। আই হ্যাড বিন দেয়ার মানে—আমি সেখানে ছিলাম।

মণ্টু আকাশ থেকে পড়ে—তবে যে আপনি বললেন বীন মানে বরবটি? তাহলে, আমি সেখানে বরবটি ছিলাম—বলুন।

মিহির সন্দেহ প্রকাশ করে,—খুব সম্ভব তাই ছিলে তুমি। Been আর Bean কি এক জিনিস হল? বানানের তফাৎ দেখছ না? এ been হল be-ধাতুর form—

বাধা দিয়ে মণ্টু বলে, হ্যাঁ বুঝেছি, আর বলতে হবে না আমাকে। অর্থাৎ কি না এ-been হল মৌমাছির চেহারা। বি মানে মৌমাছি আর ফর্ম মানে চেহারা! আমি জানি।

বিস্ময়ে হতবাক্ মিহির শুধু বলে, জানো তুমি?

—হ্যাঁ, একটু আগেই জেনেছি। আপনি চলে গেলে বাবা বললেন কি না, তোর নতুন মাস্টার মশায়ের বেশ ফর্ম—তখনই জেনে নিলাম।

মিহির কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে বললে, আমার চেহারা মৌমাছির মতো? জানতাম না তো। কিন্তু সে-কথা যাক, যে beans মানে বরবটি, তা দিয়ে সেনটেন্স হবে এই রকম—Peasants grow beans অর্থাৎ চাষারা বরবটি উৎপন্ন করে, বরবটি চাষ করে। বুঝলে?

মণ্টু ঘাড় নেড়ে জানায় বুঝেছে।

—অতটা ঘাড় নেড়ো না, ভেঙে যেতে পারে। তোমার তো আর মৌমাছির চেহারা নয় আমার মতো। বেশ, বুঝেছ যদি, এই রকম আর একটা সেনটেন্স বানাও দেখি বীন্‌স দিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে মণ্টুর মুখ নড়ে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বার হয় না। মিহির হতাশ হয়ে বলে, পারলে না? এই ধর যেমন, our cook cooks beans, আমাদের ঠাকুর বরবটি রাঁধে। এখানে তুমি কুক কথাটার দু রকম ইউজ পাচ্ছ, একটা নাউন, আরেকটা ভার্ব। আচ্ছা, আর একটা সেনটেন্স কর।

এতক্ষণে বীন্‌স ব্যাপারটা বেশ বোধগম্য হয়ে এসেছে মণ্টুর। সে এবার চটপট জবাব দেয়—we are all human beans.

—য়্যাঁ? বল কি? আমরা সবাই মানুষ-বরবটি?

—কেন? বাবাকে অনেকবার বলতে শুনেছি যে হিউম্যান বীন্‌স।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে মিহির। অর্থাৎ বসে তো সে ছিলই, মাথায় হাতটা দেয় কেবল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস এই ছেলেকেই পড়াতে হবে তাকে? ওঃ, এইজন্যই মাস্টার টিকতে পারে না? কি করে টিকবে? পড়াতে আসা—কুস্তি করতে তো আসা নয়। রোজই যদি এ রকম ধস্তাধস্তি করে দু বেলা ওকে পড়াতে হয়, তাহলেই তো সে গেছে। তাহলে তাকেও পালাতে হবে টুইশানির মায়া ছেড়ে, ত্রিশ টাকার মায়া ছেড়ে, নরম গদির মায়া ছেড়ে—

নাঃ, সে কিছুতেই পালাচ্ছে না। একজন উনত্রিশ দিন পর্যন্ত টিকেছিল আর এক দিন টিকতে পারলেই ত্রিশ টাকা পেত, কিন্তু একটা দিনের জন্য একটাকাও পেল না। বোধ হয় তার কেবল পাগল হতেই বাকি ছিল—পাগল হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়েছে। আর একটা দিন পড়াতে হলেই পাগল হয়ে যেত। কিংবা পাগল হয়েই সে পালিয়ে

গেছে হয়তো, নইলে ত্রিশ-ত্রিশটা টাকা কোনো সুস্থ মানুষ ছেড়ে যায় কখনো ? কি সর্বনাশ ! ভাবতেও হৃৎকম্প হয়।

সে কিন্তু চাকরিও ছাড়বে না, পাগলও হবে না, তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। মণ্টু যা বলে বলুক—না পড়ে না পড়ুক—বোঝে বুঝুক, না বোঝে না বুঝুক—মণ্টুকে সে বই খুলে পড়িয়ে যাবে—এই মাত্র, ওকে নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামাবে না। আর মাথাই যদি না ঘামায় পাগল হবে কি করে ? নির্বিকারভাবে সে পড়াবে—কোনো ভয় নেই তার।

তার গবেষণায় বাধা পড়ে, মণ্টু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে—বেতন-নিবারক বিছানা—এর ইংরেজী কি হবে সার্ ?

—বেতন-নিবারক বিছানা আবার কি ?

—সে একটা জিনিস। বলুন না, ওর ইংরেজীটা জেনে রাখা দরকার।

—ও রকম কোনো জিনিস হতেই পারে না।

—হতে পারে না কি, হয়ে রয়েছে। আপনি জানেন না তাহলে ওর ইংরেজী। সেই কথা বলুন।

—ওর ইংরেজী হবে পে-সেভিং বেড (Pay-Saving Bed)।

মণ্টু সন্দেহ প্রকাশ করে—শেভিং মানে তো কামানো। ছোট্টুরাম আমাদের চাকর, সে বেতন কামায়, বেতন-নিবারকে শোয় না তো সে। তাকে অনেক বার বলা হয়েছে কিন্তু কিছুতেই সে শোয় না। সেইজন্যই তো এ চাকরটা টিকে গেল আমাদের। বাবা ভারি দুঃখ করেন তাই।

কি সব হেঁয়ালি বকছে ? ছেলেটার মাথা খারাপ না কি ? যাক, ও সব ভাববে না সে। সে প্রতিজ্ঞাই করেছে—মোটেই মাথা ঘামাবে না এদের ব্যাপারে। একবার ঘামাতে আরম্ভ করলে তখন আর থামাতে

পারবে না—নির্ঘাৎ পাগল হতে হবে। আজ আর পড়ানো নয়, অনেক পড়ানো গেল, কেবল মাথা কেন, সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে তার ধাক্কায়। আজ এই পর্যন্তই থাক। মণ্টুকে সে বিদায় দিল।

এইবার একটা তোফা নিদ্রা—নরম গদির বিছানায়। দু-দুবার বৌবাজার আর বাগবাজার করেছে আজ, অনেক হাঁটাচলা হয়েছে—ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। আজ রাত্রে সে খাবে না বলেই দিয়েছে—এক বন্ধুর বাড়িতেই খাওয়াটা সেরেছে বিকেলে। ব্যস, সুইচ অফ করে এখন শুলেই হয়।

নরম বিছানায় সর্বাঙ্গ এলিয়ে দিয়ে আরামে মিহিরের চোখ বুজে এল—আঃ! নিদ্রার রাজ্যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে সে, এমন সময়ে মনে হল তার সর্বাঙ্গে কে যেন এক হাজার ছুঁচ বিঁধিয়ে দিল এক সঙ্গে। আর্তনাদ করে মিহির লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। বাতি জ্বেলে দেখে, সর্বনাশ—সমস্ত বিছানায় কাতারে কাতারে ছারপোকা—ছারপোকা আর ছারপোকা! হাজার-হাজার, লাখ-লাখ—গুণে শেষ করা যায় না। কেবল ছারপোকা!

এতক্ষণে বেতন-নিবারক বিছানার মানে সে বুঝল—বুঝতে পারল কেন মাস্টাররা টেকে না। ও বাবাঃ! কেবল ছাত্রই নয়, ছারপোকাও আছে তার সঙ্গে। ঘরে বাইরে যুদ্ধ করে একটা লোক পারবে কেন—তবু সে ভদ্রলোক ঊনত্রিশ দিন যুঝেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না—ছেড়ে পালাতে হল তাঁকে। ত্রিশ টাকা মাইনেয় মাস্টার রেখে বেতন না দিয়েই ছেলে পড়ানো—নাঃ, ভদ্রলোক কেবল উদার আর মহৎ নন, বেশ রসিক লোক তিনি! দস্তুরমতো।

ভীতি-বিহ্বল চোখে সে ছারপোকা-বাহিনীর দিকে চেয়ে রইল। গুণে শেষ করা যায় না—ওকি মেরে শেষ করা যাবে? আর সমস্ত

রাত ধরে যদি ছারপোকাই মারবে তো ঘুমোবে কখন? নাঃ, চেয়ারে বসেই আজ কাটাতে হল সমস্ত রাতটা।

আলো দেখা মাত্র ছারপোকাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য পড়ে গেছল—দু-তিন মিনিটের মধ্যে তারা আবার কোথায় মিলিয়ে গেল। মিহির ভাবল—বাপ্ স, এরা রীতিমতো শিক্ষিত যে! যেমন কুচকাওয়াজ করে এসেছিল তেমনি কুচকাওয়াজ করে চলে গেল—আধুনিক যুদ্ধের কায়দা-কৌশল সব এদের জানা দেখছি। কোথায় গেল ব্যাটারা?

সদ্য পাট-ভাঙা ধব ধবে চাদরের এক কোণ তুলে দেখে তোশকের গদির খাঁজে খাঁজে থুক থুক করছে ছারপোকা—অন্যধারেও তাই। আর বেশী সে দেখল না, কি জানি এখন থেকেই যদি মাথা খারাপ হয়ে যায়। চেয়ারে গিয়ে বসল, কিন্তু ভয়ে আলো নিবোল না—কি জানি যদি তারা সেখানে এসে তাকে আক্রমণ করে। বলা যায় না কিছু।···

পরদিন মণ্টুর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, বেশ ঘুম হয়েছিল রাত্রে?

—খাসা! অমন বিছানায় ঘুম হবে না, বলেন কি আপনি?

ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে বললেন, বেশ বেশ, ঘুম হলেই ভালো। জীবনে বিলাসই হল গিয়ে ঘুম। তা, তোমার ঘুম বোধ হয় খুব জমাট?

—আজ্ঞে, সে-কথা আর বলবেন না। একবার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাশের বাড়ি গেছলাম কিন্তু মোটেই টের পাইনি।

—বল কি?

—আমাদের বাড়ি বর্ধমানে। শুনেছেন বোধ হয় সেখানে বেজায় মশা—মশারি না খাটিয়ে শোবার যো নেই। একদিন পাশের বাড়িতে কি খুব দরকারে ডেকেছিল আমায়, কিন্তু ভুলে গেছলাম কথাটা। যখন শুতে যাচ্ছি তখন মনে পড়ল, কিন্তু তখন রাত অনেক

হয়ে গেছে, অত রাত্রে কে যায়, আর দরজা-টরজা বন্ধ করে তারা শুয়ে পড়েছে ততক্ষণ। আমি করলাম কি, সেদিন আর মশারি খাটালাম না! পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল মশাই, দেখি পাশের বাড়িতেই শুয়ে আছি।

দারুণ বিস্মিত হলেন ভদ্রলোক—কি রকম ?

—মশায় টেনে নিয়ে গেছে রাত্রে। সেইজন্যেই তো মশারি খাটাইনি। রাত-বিরেতে অনায়াসে পাশের বাড়ি যাবার ওইটেই সহজ উপায় কি না!

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন যেন—মশাতেই যখন কিছু করতে পারেনি তখন আর—কিসে কি করবে তোমার! তুমি দেখছি টিকে গেলে এখানে।

মিহির বলল, আমার কিন্তু একটা নিবেদন আছে। কয়েকটা টাকা আমাকে দিতে হবে আগাম। ছারপোকার অর্ডার দেব।

—ছারপোকার অর্ডার! কেন ? সে আবার কি হবে ?

—ও, আপনি জানেন না বুঝি ? ছারপোকার মতো এমন মস্তিষ্কের উপকারী মেমারি বাড়ানোর মহৌষধ আর নেই। বিলেতে রীতিমতো ছারপোকার চাষ হয় এইজন্য। গাধা ছেলে সব দেশেই আছে তো, তাদের কাজে লাগে। একটু থেমে সে আবার বললে, আমার এক বন্ধু তো এই ব্যবসাতেই লেগে পড়েছে—রেলগাড়ির ফাঁকফোঁকর থেকে সব ছারপোকা সে বার করে নেয়।

সাগ্রহে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কি রকম, কি রকম ? বিলেতে ছারপোকার চাষ হয় ? দাম দিয়ে কেনে লোকে ? আমদানি রপ্তানি হয়, তুমি জানো ? আমি বেচতে পারি, হাজার হাজার, লাখ লাখ—যত চাও।

—বেচুন-না। আমিই কিনে নেব। আমার নিজের কাজে লাগবে। ছারপোকার রক্ত ব্রেনের ভারি উপকারী—একটা ছারপোকা ধরে নিয়ে এমনি করে মাথায় টিপে মারতে হয়, এই রকম হাজার হাজার লাখ লাখ ছারপোকার রক্তে এক ছটাক ব্রেন হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন,—বি. এ. পাসের সময়ে আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। সারা বছর ফাঁকি দিয়েছি, ফেল না হয়ে আর যাই না। এমন সময়ে এক বিলিতী কাগজে ছারপোকার উপকারিতা পড়া গেল, অমনি সমস্ত বাসা খুঁজে যার বিছানায় যা ছারপোকা ছিল, সব সদ্ব্যবহার করলাম। পরীক্ষা দেবার তখন মাত্র তিন দিন বাকি, তারপর ফল যা পেলাম নিজের চোখেই দেখুন, আমার কাছেই আছে, বি. এ. পাস করলাম উইথ ডিস্টিঙ্কশন—

কাল থেকেই সে ব্যগ্র হয়ে ছিল,—এখন সুযোগ পেতেই সার্টিফিকেটখানা মণ্টুর বাবার মুখের সামনে মেলে ধরল। ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো হয়ে উঠল বিস্ময়ে—সত্যিই তো! একটা কথাও মিথ্যে নয়, Passed with Distinction—লেখাই রয়েছে। বটে, এমন জিনিস ছারপোকা! কে জানতো!

—পয়সা খরচ করে ছারপোকা কিনতে হবে না, তোমার বিছানাতেই রয়েছে—হাজার হাজার লাখ লাখ, যত চাও। তোমার ভয়ানক ঘুম বলে জানতে পারনি।

—এতক্ষণ কেন বলেননি আমায়? অনেকখানি ব্রেন করে ফেলতাম। এ বেলা আমার নেমন্তন্ন আছে ভবানীপুরে, এখনই বেরোতে হবে নইলে এক্ষুণিই, যাক,—দুপুরে ফিরেই ওগুলোর সদ্ব্যবহার করব। তার পরে পড়াব মণ্টুকে।

মিহির চলে গেলে পিতাপুত্রে অনেকক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি হয়।

অবশেষে মণ্টুর বাবা বলেন, ছারপোকার সঙ্গে যে ব্রেনের সম্বন্ধ আছে, অনেক দিনই একথা মনে হয়েছে আমার। ছারপোকার ব্রেনটা একবার ভাবো দিকি, অবাক হয়ে যাবে তুমি। ঘুচ করে এসে কামড়েছে, তক্ষুণি উঠে দেশলাই জ্বাল দেখতে পাবে না তাকে, কোথায় যে পালিয়েছে, আর তার পাত্তা নেই। মানুষ যে দেশলাই আবিষ্কার করেছে, এ পর্যন্ত ওদের জানা। এটা কি কম ব্রেন? আর এ ব্রেন তো ওদের রক্তেই, কেন না মাথা তো নেই ওদের, গায়েই ওদের ব্রেন। ঠিক বলেছে মিহির। মণ্টু, তুই কি বলিস?

—হ্যাঁ বাবা।

—তার পর ছারপোকার সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও কম নয়। ছারপোকা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বিস্তার বাড়ে। ট্রামে বাসে সিনেমায় যেমন ছারপোকা বেড়েছে, তেমনি হু হু করে খবরের কাগজের কাটতিও বেড়ে গেছে। এই সেদিন বায়স্কোপে আমাদের সামনেই সাড়ে চার আনার সীটে একটা কুলী বসেছিল, তোর মনে পড়ে না মণ্টু?

—হ্যাঁ বাবা।

—সে তো লেখাপড়া কিছুই জানে না। দু মিনিট না বসতেই দু পয়সা খরচ করে একখানা আনন্দবাজার কিনে ফেলল সে। এতে শিক্ষার বিস্তার হল না কি? মণ্টু, কি বলিস তুই?

—হ্যাঁ বাবা।

—চল তবে এক কাজ করিগে। তোর মাস্টার মশাই ফেরার আগে আমরাই ছারপোকাগুলোর সদ্ব্যবহার করে ফেলি। ব্রেন তো তোরও দরকার, আর আমার মেমারিটাও দিন কত থেকে যেন কমে এসেছে। সেদিন শ্যামবাবুকে মনে হল গোবর্ধনবাবু আর গোবর্ধনবাবুকে মনে

হল থাতিয়েকান্ত! এ তো ভালো কথা নয়। কি বলিস মণ্টু?

—হ্যাঁ বাবা।

সন্ধ্যের পরে ফিরল মিহির। কাল সারা রাত ঘুম নেই, তার পর আজ সমস্ত দিন বন্ধুদের আড্ডায় তাস পিটে এমন ক্লান্ত হয়েছে যে ঘুমোতে পারলে বাঁচে। আজ সে আলো জ্বালিয়েই শোবে—আলোতে যদি না আসে ব্যাটারা। এখন 'নমো নমো' করে মণ্টুকে খানিকক্ষণ পড়াতে পারলেই ছুটি।

মণ্ট বই নিয়ে আসতেই সমস্ত ঘরে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

—নতুন ধরনের এসেন্স-টেসেন্স মেখেছ না কি কিছু? ভারি গন্ধ আসছে তোমার গা থেকে। মিহির জিজ্ঞাসা করল।

—গা নয়, মাথা থেকে সার্।

—কিসের গন্ধ?

—ছারপোকার। আপনি চলে যাবার পর বাবা আর আমি দুজনে মিলে 'বেতন-নিবারকে'র সমস্ত ছারপোকা শেষ করেছি। ছোট্টু-রামকেও বলেছিলাম, কিন্তু সে-ব্যাটা মোটেই ব্রেন চায় না। আর একটাও ছারপোকা নেই আপনার বিছানায়। হি হি হি!

—য়্যাঁ?— সিংহনাদ করে মিহির চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। মণ্টু তো হতভম্ব। দারুণ চীৎকার শুনে মণ্টুর বাবা ছুটে এলেন।—কি হয়েছে রে মণ্টু, কি হল?

—ছারপোকা নেই শুনে মাস্টার মশাই অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন!

—তা তুই বলতে গেলি কেন? শোকের প্রথম ধাক্কায় ওরকম হয়। বারণ করলাম না তোকে? অতগুলো ছারপোকার মৃত্যুশোক, কম কথা নয় তো?

—আমি কি করে জানব যে উনি অমন করবেন। মুখে জল ছিটোলে জ্ঞান হয় শুনেছি, ছিটোব বাবা?

অজ্ঞান অবস্থাতেই মিহিরের গলা দিয়ে বেরোয়—উঁহুঁ।

মন্টুর বাবা বলেন, কাজ নেই। জ্ঞান হলে যদি কামড়ে দেয় রাগের মাথায়? শোকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাক। এক আধ দিন অজ্ঞান হয়ে থাকলেই সেরে যাবে—সময়ই একমাত্র ওষুধ হচ্ছে শোকের। কথায় বলে, টাইম ইজ দি বেস্ট হীলার—কি বলিস মন্টু?

—হ্যাঁ বাবা।

মিহিরের জ্ঞান হল তার পরদিন বেলা আটটায়।

আমার বাঘ শিকার

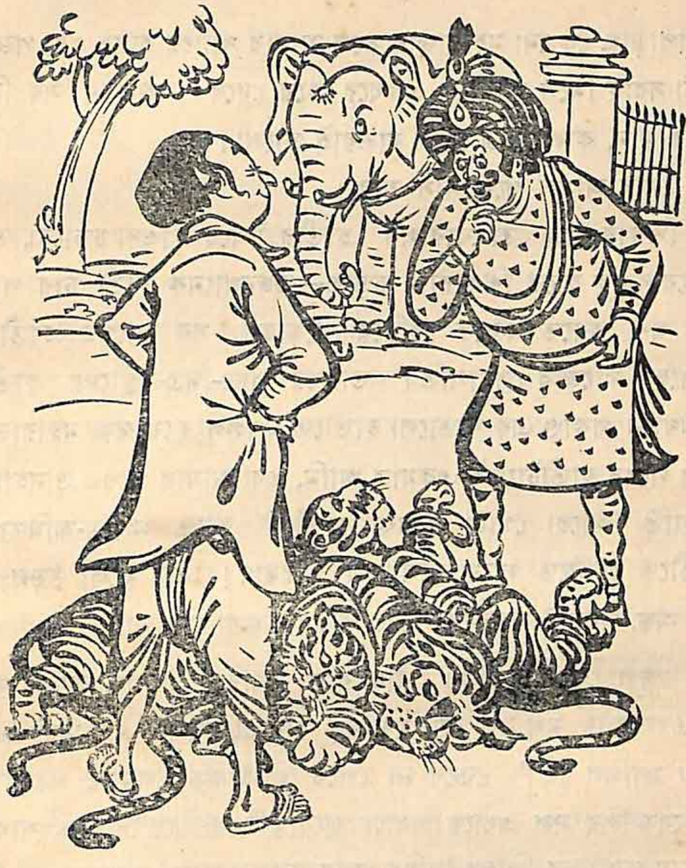
মুখের দ্বারা বাঘ মারা কঠিন নয়। অনেকে বড় বড় কেঁদো বাঘকে কাঁদো কাঁদো মুখে আধমরা করে ঐ দ্বারপথে এনে ফেলেন। কিন্তু মুখের দ্বারা ছাড়াও বাঘ মারা যায়। আমিই মেরেছি।

মহারাজ বললেন, বাঘ-শিকারে যাচ্ছি। যাবে আমাদের সঙ্গে?

'না' বলতে পারলাম না। এতদিন ধরে তাঁর অতিথি হয়ে নানাবিধ চর্বচোষ্য খেয়ে অবশেষে বাঘের খাদ্য হবার সময়ে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলে না। কেমন যেন চক্ষুলজ্জায় বাধতে থাকে।

হয়তো বাগে পেয়ে বাঘই আমায় শিকার করে বসবে; তবু মহারাজার আমন্ত্রণ কি করে অস্বীকার করি? বুক কেঁপে উঠলেও হাসি হাসি মুখ করে বললাম, চলুন, যাওয়া যাক। ক্ষতি কি?

মহারাজার রাজ্য জঙ্গলের জন্যে এবং জঙ্গল বাঘের জন্যে বিখ্যাত। এর পরে তিনি কোথাকার মহারাজা, তা বোধ হয় না বললেও চলে। বলতে অবশ্য কোনো বাধা ছিল না, আমার পক্ষে তো নয়ই, কেন না রাজামহারাজার সঙ্গেও আমার দহরম-মহরম আছে—সেটা বেফাঁস হয়ে গেলে আমার বাজারদর হয়তো একটু বাড়তোই। কিন্তু মুশকিল এই, টের পেলে মহারাজ হয়তো আমার বিরুদ্ধে মানহানির দাবি আনতে পারেন—এবং টের পাওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। মহারাজা না পড়ুন, মহারাজকুমারেরা যে আমার লেখা পড়েন না, এমন কথা হলফ করে বলা কঠিন। তাছাড়া আমি যে পাড়ায় থাকি, যে



এতগুলো বাঘকে···শিকার করেছি···বিশ্বাস করা ···তেমনি কঠোর পৃষ্ঠা ৯৯

গুণ্ডাপাড়ায়, কোনো মহারাজার সঙ্গে আমার খাতির আছে ধরা পড়লে তারা সবাই মিলে আমাকে একঘরে করে দেবে। অতএব সব দিক ভেবে স্থান, কাল, পাত্র চেপে যাওয়াই ভালো।

এবার আসল গল্পে আসা যাক।

শিকার-যাত্রা তো বেরোল। হাতীর উপরে হাওদা চড়ানো, তার উপরে বন্দুক হাতে শিকারীরা চড়াও—ডজনখানেক হাতী চার পায়ে মশ মশ করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। সব আগের হাতীতে চলেছেন রাজ্যের সেনাপতি। তারপর পাত্র-মিত্র-মন্ত্রীদের হাতী; মাঝখানে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতীতে মশগুল হয়ে স্বয়ং মহারাজা; তাঁর পরের হাতীটাতেই একমাত্র আমি, এবং আমার পরেও ডানহাতি, বাঁহাতি আরো গোটা কয়েক হাতী! তাতে অপাত্র-অমিত্ররা! হাতীতে হাতীতে যাকে বলে ধূল পরিমাণ! এত ধূলো উড়ল যে দৃষ্টি অন্ধ, পথঘাট অন্ধকার—তার পরিমাণ করা যায় না।

জঙ্গল ভেঙে চলেছি। বাঁধা রাস্তা পেরিয়ে এসেছি অনেক ক্ষণ, —এখন আর মশ মশ নয়, মড় মড় করে চলেছি। এই 'মর্মর-ধ্বনি কেন জাগিল রে!' ভেবে না পেয়ে হতচকিত শেয়াল, খরগোশ, কাঠবেড়ালির দল এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিয়েছে, শাখায় শাখায় পাখীদের কিচির মিচির, আর আমরা কারো পরোয়া না করে চলেছি। হাতীরা কারো খাতির করে না।

চলেছি তো কতক্ষণ ধরে। কিন্তু কোনো বাঘের ধড় দূরে থাক, একটা ল্যাজও চোখে পড়ে না। হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর কিসের শোরগোল শোনা গেল। কোত্থেকে একদল বুনো জংলী লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল। তারা বনের মধ্যে ঢুকে কি করছিল কে জানে! মহারাজা হয়তো বাঘের বিরুদ্ধে তাদের গুপ্তচর লাগিয়ে

থাকবেন। তারা বাঘের খবর নিয়ে এসেছে মনে হতেই আমার গায়ে ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু তারা বাঘের বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করে হাত-তী হাত-তী বলে চেঁচাতে লাগল।

হাত-তী তো কি? হাতী যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ—হাতী কি কখনো দেখনি না কি? ও নিয়ে অমন হৈ চৈ করবার কি আছে? হাতীর কানের কাছে ওই চেঁচামেচি আর চোখের সামনে ওরকম লম্ফঝম্প আমার ভালো লাগে না। হাতীরা বন্য ব্যবহারে চটে গিয়ে ক্ষেপে যায় যদি? হাতীরও তো মানমর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে!

মহারাজাকে কথাটা আমি বললাম। তিনি জানালেন যে, আমাদের হাতীর বিষয়ে ওরা উল্লেখ করছে না, একপাল বুনো হাতী এদিকেই তাড়া করে আসছে, সেই কথাই ওরা তারস্বরে জানাচ্ছে! এবং কথাটা খুব ভয়ের কথা। তারা এসে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। হাতী এবং হাওদা সমেত সবাইকে আমাদের দ'লে পিষে মাড়িয়ে একেবারে ময়দা বানিয়ে দেবে।

তৎক্ষণাৎ হাতীদের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া হল। কথায় বলে হস্তি-যূথ, কিন্তু তাদের ঘোরানো-ফেরানোর এত বেজুত যে বলা যায় না। যাই হোক, কোনো রকমে তো হাতীর পাল ঘুরল, তারপরে এল পালাবার পালা।

আমার পাশ দিয়ে হাতী চালিয়ে যাবার সময় মহারাজা বলে গেলেন, খবরদার! হাতীর থেকে একচুল যেন ন'ড় না। যত বড় বিপদই আসুক, হাতীর পিঠে লেপটে থাকবে। দরকার হলে দাঁতে কামড়ে, বুঝেছ?

বুঝতে বিলম্ব হয় না। দূরাগত বুনোদের বজ্রনাদী বৃংহণধ্বনি শোনা যাচ্ছিল—সেই ধ্বনি হন হন করতে করতে এগিয়ে আসছে। আরো—আরো কাছে, আরো আরো কাছিয়ে। ডালে ডালে বাঁদররা কিচমিচিয়ে উঠেছে। আমার সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। ঘেমে নেয়ে গেলাম।

এদিকে আমাদের দলের আর আর হাতীরা বেশ এগিয়ে গেছে। আমার হাতীটা কিন্তু চলতে পারে না। পদে পদে তার যেন কিসের বাধা! মহারাজার হাতী এত দূর এগিয়ে গেছে যে, তার লেজ পর্যন্ত দেখা যায় না। আর সব হাতীরাও যেন ছুটতে লেগেছে। কিন্তু আমার হাতীটার হল কি! সে যেন নিজের বিপুল বপুকে টেনে নিয়ে কোনো রকমে চলেছে।

আমাদের দলের অগ্রণী হাতীরা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এধারে বুনো হাতীর পাল পেল্লায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে—ক্রমশই তার আওয়াজ জোরাল হতে থাকে। আমার মাহুতটাও হয়েছে বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হলেও সে-ই তখন আমাদের একমাত্র ভরসা।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে! তোমার হাতী চলছে না কেন? জোরসে চালাও। দেখছ কি?

—জোরে আর কি চালাব হুজুর? তিন পায়ে হাতী আর কত জোরে চলবে বলুন? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে।

—তিন পা! তিন পা কেন? হাতীদের তো চার পা হয়ে থাকে বলেই জানি। অবশ্য, এখন পিঠে বসে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু চার পা দেখেই উঠেছিলাম বলে যেন মনে হচ্ছে। অবশ্য, ভালো করে ঠিক খেয়াল করিনি।

—এর একটা পা কাঠের যে! পেছনের পা-টা। খানায় পড়ে পা ভেঙে গেছল। রাজাসাহেব হাতীটাকে মারতে রাজী হলেন না, সাহেব ডাক্তার এসে পা কেটে বাদ দিয়ে কাঠের পা জুড়ে দিয়ে গেল। এমন রঙ বার্নিশ যে ধরবার কিছু জো নেই। ইস্‌ট্রাপ দিয়ে বাঁধা কি না!

শুনে মুগ্ধ হলাম। ডাক্তার সাহেব কেবল হাতীর পা-ই নয়, আমার গলাও সেইসঙ্গে কেটে রেখে গেছেন। আবার মহারাজেরও এমন মহিমা, কেবল বেছে বেছে খোঁড়া হাতীই নয়, দুগ্ধপোষ্য একটা খুদে মাহুতের হাতে অসহায় আমায় সমর্পণ করে সরে পড়লেন!

—কাঠের হাতী নিয়ে বাচ্চা ছেলে তুমি কি করে চালাবে? আমি অবাক হয়ে যাই।

—বার্লি আমার নাম, সে সগর্বে জানাল,—আর আমি হাতী চালাতে জানব না?

—বার্লি? ভারি অদ্ভুত নাম তো!—আমার বিস্ময় লাগে।

—আমি সাবুর ভাই। সাবু আমেরিকায় গেছে ছবি তুলতে।

—তোমার বার্লিনে যাওয়া উচিত ছিল। না বলে আমি পারলাম না।—গেলে ভালো করতে।

শোনবামাত্রই নিজের ভুল শোধরাতেই কি না কে জানে, তৎক্ষণাৎ সে হাতীর ঘাড় থেকে নেমে পড়ল। নেমেই বার্লিনের উদ্দেশেই কি না কে বলবে, দে ছুট! দেখতে দেখতে আর তার দেখা নেই। জঙ্গলের আড়ালে হাওয়া।

আমি আর আমার হাতী, কেবল এই দুটি প্রাণী পেছনে পড়ে রইলাম। আর পেছন থেকে তেড়ে আসছে পাগলা হাতীর পাল! তেপায়া হাতীর পিঠে নিরুপায় এক হস্তিমূর্খ।

কিন্তু ভাববার সময় ছিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাজ পড়ার মতো আওয়াজ চার ধার থেকে আমাদের ছেয়ে ফেলল। গাছ-পালার মড়মড়ানির সঙ্গে চোখ ধাঁধানো ধুলোর ঝড়! তার ঝাপটায় আমার দম আটকে গেল একেবারে।

মহারাজার উপদেশমতো আমি এক চুল নড়িনি, হাতীর পিঠে লেপটে সেঁটে রইলাম! হাতীর পাল যেমন প্রলয়নাচন নাচতে নাচতে এসেছিল, তেমনি হাঁক-ডাক ছাড়তে ছাড়তে নিজের ধান্দায় চলে গেল।

তারা উধাও হলে আমি হাতীর পিঠ থেকে নামলাম। নামলাম না বলে খসে পড়লাম বলাই ঠিক। হাতে পায়ে যা খিল ধরেছিল! নীচে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিচ্ছি, ও-মা, আমার কয়েক গজ দূরে এ কি দৃশ্য! লম্বা চওড়া বেঁটে খাটো গোটা পাঁচেক বাঘ একেবারে কাত হয়ে শুয়ে! কর্তা, গিন্নী, কাচ্চা-বাচ্চা সমেত পুরো একটা ব্যাঘ্র-পরিবার! হাতীর তাড়নায়, হয়তো বা তাদের পদাঘাতেই, কে জানে, হতচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

কাছাকাছি কোথাও জলাশয় থাকলে কাপড় ভিজিয়ে এনে ওদের চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে পারলে হয়তো বা জ্ঞান ফেরানো যায়। কিন্তু এই বিভুঁয়ে কোথায় জলের আড্ডা, আমার জানা নেই। তাছাড়া, বাঘের চৈতন্য-সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্গত কি না, সে বিষয়েও আমার একটু সংশয় ছিল।

আমি করলাম কি, প্রবীণ বনস্পতিদের ঘাড় বেয়ে যেসব ঝুরি নেমেছিল তারই গোটাকতক টেনে ছিঁড়ে বাঘগুলোকে একে একে পিছমোড়া করে বাঁধলাম। হাত, পা, মুখ বেঁধে-ছেঁদে সবাইকে পুঁটলি বানিয়ে ফেলা হল—তখনো ব্যাটারা অজ্ঞান।

হাতীটা এতক্ষণ ধরে নিস্পৃহভাবে আমার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার উৎসাহ পেয়ে এগিয়ে এসে তার লম্বা শুঁড় দিয়ে এক একটাকে তুলে ধরে নিজের পিঠের উপর চালান দিতে লাগল। সবাই উঠে গেলে পর সব শেষে ওর ল্যাজ ধরে আমিও উঠলাম। তখনো বাঘগুলো অচেতন। সেই অবস্থাতেই হাওদার সঙ্গে শক্ত করে আর এক প্রস্থ ওদের বেঁধে ফেলা হল।

পাঁচ-পাঁচটা আস্ত বাঘ—একটাও মরা নয়, সবাই জলজ্যান্ত। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিশ্বাস পড়ছে বেশ। এতগুলো জ্যান্ত বাঘ একাধারে দেখলে কার না আনন্দ হয়? একদিনের এক চোটে এক সঙ্গে এতগুলো শিকার—এ কি কম কথা?

গজেন্দ্রগমনে তারপর তো আমরা রাজধানীতে ফিরলাম। বাচ্চা মাহুত বার্লি ব্যগ্র হয়ে আমাদের প্রতীক্ষা করছিল। এখন অতগুলো বাঘ আর বাঘান্তক আমাকে দেখে বারংবার সে নিজের চোখ মুছতে লাগল। এরকম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস সে করতে পারছিল না।

খবর পেয়ে মহারাজা ছুটে এলেন। বাঘদের হাওদা থেকে নামানো হল। ততক্ষণে তাদের জ্ঞান ফিরেছে, কিন্তু হাত পা বাঁধা—নেহাৎ বাঁধা! নইলে, পারলে পরে, তারাও বার্লির মতো একবার চোখ মুছে ভালো করে দেখবার চেষ্টা করতো।

এতগুলো বাঘকে আমি একা স্বহস্তে শিকার করেছি, এটা বিশ্বাস করা বাঘদের পক্ষেও যেমন কঠিন, মহারাজার পক্ষেও তেমনি কঠোর। কিন্তু চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দেখলে অবিশ্বাস করবার কিছু ছিল না।

কেবল বার্লি একবার ঘাড় নাড়বার চেষ্টা করেছিল—এতগুলো বাঘকে আপনি একলা—হাতিয়ার নেই, কিছু নেই···বহুৎ তাজ্জব কি বাত···!

আরে হাতিয়ার নেই, হাত ছিল তো? বাধা দিয়ে বলতে হল আমায়। আর, তোমার হাতীর পা-ই তো ছিল হে! তাই কি কম হাতিয়ার? বাঘগুলোকে সামনে পাবামাত্রই, বন্দুক নেই টন্দুক নেই করি কি, হাতীর কাঠের পা-খানাই খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে দু হাতে তাই দিয়েই এলোপাতাড়ি বসাতে লাগলাম। ঘা কতক দিতেই সব ঠাণ্ডা! হাতীর পদাঘাত—কি কম ব্যাপার? অবশ্য, তোমাদের হাতীকেও ধন্যবাদ দিতে হয়। বলবামাত্র পেছনের পা দান করতে সে পেছ-পা হয়নি। আমিও আবার কাজ সেরে তেমনি করেই তার ইস্ট্রাপ লাগিয়ে দিয়েছি। ভাগ্যিস, তুমি হাতীটার কেটো পা-র কথা আমায় বলেছিলে···!

অম্লান বদনে এত কথা বলে হাতীর দিকে চোখ তুলে চাইতে আমার লজ্জা করছিল। হাতীরা ভারি সত্যবাদী হয়ে থাকে। এবং হাতীদের মতো সাধুপুরুষ দেখা যায় না প্রায়। ওর পদচ্যুতি ঘটিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছি এই মিথ্যা কথায় কেবল বিরক্তি নয়, ও যেন রীতিমতো অপমান বোধ করছিল। এমন বিষ-নজরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে যে—কি বলব! বলা বাহুল্য, তারপর আর আমি ওর ত্রিসীমানায় যাইনি।

হাতীরা সহজে ভোলে না।

তারে চড়ার নানান ফ্যাসাদ

তোমাদের কারো ওদিকে ঝোঁক আছে কি না আমার জানা নেই, তবে আমি—সত্যি কথা বলতে কি—তারে চড়তে একেবারেই ভালোবাসিনে। চলাচলের পক্ষে রাস্তা হিসেবে ওকে খুব প্রশস্ত বলা চলে না ; তাছাড়া, (টেলিগ্রাফেরই বল, আর সার্কাসেরই বল) যেসব পোস্টের উপরে সাধারণত তার খাটানো হয়, মাটি থেকে তার বেশ উচ্চতা আছে। এই কারণে প্রতিপদেই বিপদের আশঙ্কা।

কিন্তু এককালে, টেলিগ্রামের মতো, তারে যাতায়াত করাই আমার কাজ ছিল। আমি সার্কাস ছেড়েছি, তা খুব বেশী দিনের কথা নয়। তারের উপর দিয়ে হাঁটা, কায়দা-কসরত দেখানোর চেষ্টা করা, নানাবিধ তারের খেলা দেখানোই ছিল তখন আমার রোজকার কাজ এবং রোজগারের কাজ—ঐ উপায়েই আমার দিন গুজরান হত। কিন্তু একদা তার-যোগে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাবার ফলেই দারুণ বিরক্ত হয়ে সার্কাস আমি ছেড়ে দিয়েছি। সে-কথা ভাবতে গেলে এখনো আমার—, কিন্তু যাক সে-কথা।

তোমরা হয়তো অনুমান করছ আমি পড়ে গেছলাম ? উঁহু, মোটেই তা নয়। পড় পড় হয়েছিলাম, কিন্তু পড়িনি। কিন্তু না পড়ে যা হয়েছিলাম তার চেয়ে পড়ে যাওয়াই ছিল ভালো। আমার সেই অপদস্থ অবস্থায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকল শ্রেণীর দর্শকেরাই এক বাক্যে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন একথা অস্বীকার করব না। তোমাদের



অবলীলাক্রমে তারের উপর দিয়ে চলতে শুরু করি। পৃষ্ঠা ১১৫

মধ্যে অনেকে হয়তো সেই খেলাটা আর একবার দেখতে চেয়েছিলে। আবার দেখার প্রত্যাশায় পরের দিনের টিকিটও হয়তো কিনে থাকবে, কিন্তু সে-খেলা দেখাতে আমি আর রাজী হইনি। তারপর কোনো খেলাই আমি আর দেখাইনি, তারে চড়াই ছেড়ে দিয়েছি।

আঃ, সেই জুতো জোড়ার কথা মনে হলে আজও আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমার তার-পথের সহযাত্রী, আমার বিপজ্জনক সহচর সেই জুতো জোড়া—তাদের সহায়তায়; এমন কি তাদেরই প্ররোচনায় সার্কাসে তারের খেলা দেখাবার প্রস্তাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম! কত বার সত্যি-সত্যিই তারা আপদ বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু বিপদ থেকে যে বাঁচায়, প্রয়োজন হলে এবং প্রয়োজন না হলেও, সে-ই যে বেশী বিপন্ন করতে পারে এ অভিজ্ঞতা তাদের কাছ থেকেই আমার হল।

সার্কাস ছাড়ার পর আমি তাদের মুখদর্শনও করি না। তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছি; কোথায় ফেলেছি মনে নেই, আমারই ঘরের আনাচে-কানাচে, দেরাজ-আলমারির পেছনে-টেছনে কোথাও। আমার দৃষ্টির সম্মুখসীমার বাইরে।

কেন তারে চড়া ছাড়লাম সে-কথা বলব না—কিন্তু হ্যাঁ, তারে চড়া ছেড়ে দিয়েছি তার পর। আমার আর ঝোঁক নেই ওদিকে। কিন্তু মানুষ যা চায় না তা-ই এসে তার ঘাড়ে চড়ে—সেই কথাই আজ তোমাদের বলব।

আমাদের বাড়ির সামনে সমীরদের বাড়ি—সেই সমীর, ক্রিকেট খেলায় যার জোড়া মেলে না। কিন্তু খেলাধুলার কথা নয় কোনো, কথা হচ্ছে এই, আমাদের তেতলার ছাদ দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে তাদের বাড়ির গা ঘেঁষে গেছে একটা জিনিস। আর কিছু নয়, টেলিফোনের তার।

সেদিন সকালে উঠে দেখলাম একটা ঘুড়ি কোত্থেকে সেই তারে এসে আটকেছে। রঙিন ঘুড়ি, বেশ চৌকোনা, তারে বেধে দোল খাচ্ছে হাওয়ায়।

ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে আমি বাল্যকালকে স্মরণ করছি। বাল্যকাল এবং সার্কাস-কাল।

দুয়ের যোগাযোগ হলে তো কথাই ছিল না। সেই মার্কামারা জুতো জোড়ার সাহায্য নিয়ে তারের উপর দিয়ে গিয়ে ওটাকে পেড়ে এনে এতক্ষণ ওড়াতেই আরম্ভ করে দিতাম হয়তো।

ইত্যাকার চিন্তা করছি, এমন সময়ে নীচের রাস্তা থেকে বালসুলভ কণ্ঠস্বর এসে ধাক্কা মারে—মশাই, ও মশাই!

রাস্তার দিকে তাকাই। এমন কেউ না, আমারই জনৈক বালক-প্রতিবেশী।

রঙচঙে ঘুড়িটা ওরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পড়তে বসেছিল, সেই দুর্যোগের মুহূর্তে ঘুড়িটা চোখে পড়ল—বই ফেলে এসেছে, কিন্তু মই নিয়ে আসেনি। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, মই না আনার মূর্তিমান কারণ হচ্ছি আমি।

—ঘুড়িটা আমায় পেড়ে দিন না মশাই।

—কি করে পাড়ব? নাগালের বাইরে যে! হাত বাড়িয়ে ওকে দেখালাম। আমার দোতালার বারান্দা থেকে যতদূর সম্ভব হস্ত বিস্তার করলেও মস্ত ব্যবধান।

—আপনি তারের উপর দিয়ে গিয়ে এনে দিন। ছেলেটি আবদার ধরে।

—বাঃ, পড়ে যাব যে! দেখছ তো কত উঁচুতে? ওখান থেকে পড়লে আর কি বাঁচব? সমুজ্জল ভবিষ্যৎটা যতদূর সম্ভব ওর দিব্য

দৃষ্টির কাছে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি—একদম ছাতু একেবারে, বুঝেছ, আর দেখতে-শুনতে হবে না।

—বাঃ, আপনি পড়বেন কেন ? আপনি আবাব পড়েন না কি ? সে শুনতেই চায় না—তারে চড়তে পারেন যে আপনি !

—বটে ? তারে চড়তে পারি ? বল কি ! এমন দুঃসংবাদ কে দিল তোমায় ?

—হুম, মামার কাছে শুনেছি আমি। মামা বলেন, আপনি সার্কাসে তারে চড়তেন।

মামার কাছে যে শোনে তাকে থামানো সহজ নয়। আমি বলি—তুমি এক কাজ কর, তোমার মামার ঘাড়ে চড়ে দেখ না কেন, যদি নাগাল পাও।

এ পরামর্শ সে অগ্রাহ্য করে, তার মামা না কি ভারি বেঁটে। অগত্যা তাকে সান্ত্বনা দিই—ঘুড়ি ওড়াবে, তোমার একটা ঘুড়ি চাই, এই তো ? এই পয়সা নাও, ঘুড়ি কেনগে।

আনিটা পেয়ে ছেলেটা লাফাতে লাফাতে চলে যায়। খানিক বাদে আর একটি ছেলে—তার চেয়ে কিছু ক্ষুদ্রাকার—দেখি সামনের রাস্তায় ঘুড়ির ঠিক অব্যবহিত নীচেই এসে দাঁড়িয়েছে।

—আমাকে ঘুড়িটা দেবেন ?

—স্বচ্ছন্দে। তুমি নিয়ে যেতে পার, আমার বিশেষ আপত্তি নেই।

—আমি কি করে পাড়ব ? আমি কি তারে চড়তে জানি ? ছেলেটি জবাব দেয়।

ও বাবা ! এও তারে চড়ার কথা বলে যে ! ভয়ে ভয়ে বলি—তা আমিই কি তারে চড়তে জানি ?

—বাঃ, আপনি জানেন না আবার! চড়ে চড়ে কত তার ক্ষইয়েই ফেললেন! সবাই তো বলে! আপনি আমায় পেড়ে দিন।

—এক কালে পারতাম বটে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হই—কিন্তু এখন তো আর চড়ার অভ্যেস নেই অনেক দিন—যদি পড়েই যাই ?

—পড়বেন না, ছেলেটি খুব জোরের সঙ্গে বলে—কিছুতেই পড়বেন না, বলছি আমি। আপনি দেবেন—হ্যাঁ।

তার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে বিস্মিত করে। আমি কিন্তু সহজে বিচলিত হই না—সে-কথা কি বলা যায় ? পড়ে গিয়ে কি পা ভাঙব শেষটায় ?

—ভাঙে যদি আমি দায়ী। ও আমাকে ভরসা দেয়।

পরের দায়িত্বে পদচ্যুত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কি না একবার ভাবি। পা-ই যদি ভাঙে, তাই ভেঙে ক্ষান্ত হবে কি না কে জানে? মাথার উপর দিয়েও চোটটা যেতে পারে। তেতলা থেকে পড়বার সময় বেতালা হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী—সাধারণ মানুষের তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকার কথা নয়। ছেলেটার শিরোদেশ থেকে ঘুড়ির উড়ন্ত দূরত্ব (অথবা দুরন্ত উড়ত্ব) পর্যন্ত মনে মনে একবার মেপে নিই।

—আপনি অত ভীতু কেন? সে আমাকে প্রেরণা দেবার প্রয়াস পায়।

আমি লজ্জিত হই, কিন্তু সাহসী হতে পারি না।—ভয় আমার নেই, তবে কি জানো, ক'দিন থেকে পায়ে একটা ব্যথা—

ছেলেটি কথা শেষ হতে দেয় না—তাহলে দাদাকে আপনি যা দিয়েছেন আমাকেও তাই দিন। ঘুড়ি আমি কিনেই নেব।

—ও, তাই বল। জোর করে একটু হাসি—সে-কথা মন্দ না। আনিটা হস্তগত হবামাত্র ছেলেটা অস্তগত হয়।

নাঃ, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়—এখুনি হয়তো আবার কার ভাগনে এসে ঘুড়িটার ভাগ নিতে চাইবে। অনেক ছেলের চোখেই ঘুড়িটা এতক্ষণে পড়েছে নিশ্চয়। এ পাড়ার অনেকেরই বেশ উঁচু নজর আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। রাস্তার সীমান্তে একটি বালকের আবির্ভাব হতেই আমি আতঙ্কিত হয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করি। অতদূর থেকেই—আমার মনোভাব টের পেয়েই বোধ হয়—ছেলেটা দৌড়তে শুরু করে দেয়। পেছন ফিরতে না ফিরতে ওর ডাক পৌঁছয়—মশাই, ও মশাই!

কাতর আহ্বানে কর্ণপাত করতে হয় (আমি তো কি ছার, ভগবান পর্যন্ত করে থাকেন বলে শোনা গেছে)। —কি খবর তোমার? বলে ফেল চট্‌পট।

—ওই ঘুড়িটা আমায় দিন না। ছেলেটা হাঁপাতে থাকে।

—ও কি আমার ঘুড়ি যে আমি দেব? এবার আমি সত্যি সত্যিই চটে গেছি।—কার ঘুড়ি আমি জানিও না।

—তবে ঘুড়ি কেনার পয়সা দিন। ছেলেটা স্পষ্টবক্তা এবং বেশী কথা বলতে ভালোবাসে না।

অগত্যা ওকেও একটা আনি ছুঁড়ে দিই। তিন-তিনটা আনি বাজে খরচে মনটা কচ কচ করতে থাকে।

টেবিলে গিয়ে বসতে না বসতেই নীচে থেকে হেঁড়ে গলায় আওয়াজ আসে—অগাস্টাস সার্কাসের বিখ্যাত তারের ক্রীড়াপ্রদর্শক তারেশ্বরবাবু কি বাড়ি আছেন?

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই—আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছি। কি দরকার বলুন? ঘুড়িটার দিকে একবার বঙ্কিম কটাক্ষে তাকিয়ে নিই, এঁরও যেন ওর উপরেই নজর—এই রকম একটা আশঙ্কা হতে থাকে।

তা, তারেশ্বরবাবু— ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেন।

(তারের ঈশ্বর ইতি তারেশ্বর ; সার্কাস থেকে এই নাম আমার পাওয়া। যে-লোকটা ঘোড়ার খেলা দেখাত তার নাম হয়েছিল ঘোড়েল। এ নিতান্ত মন্দ না, নাম-কে-নাম খেতাব-কে-খেতাব !)

তারেশ্বরবাবু, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না করেন। ভদ্রলোকের হাতের কাজ চলতেই থাকে। দেখুন, আমার ভাগনেরা আবদার ধরেছে—

বাক্যটা আমি সংক্ষিপ্ত করে আনি—কিন্তু তাদের তো আমি—

—হ্যাঁ, তারা কিনছিলও বটে। আমিই সেই মনোহারী দোকানে দাঁড়িয়ে। আমিই বারণ করলাম, বললাম, ঘুড়ি কিনে পয়সা বাজে নষ্ট করছিস কেন ? আমাদের পাড়ায় বিখ্যাত তারের ক্রীড়া-প্রদর্শক তারেশ্বরবাবু আছেন—

আমি তাঁকে বাধা দিই—তারেশ্বর হতে পারি কিন্তু তারকেশ্বর তো নই—সব প্রার্থনা পূর্ণ করা কি সাধ্য আমার ?

তিনি আমার কথায় কানই দেন না, বলে চলেন—তাঁকে বললেই তিনি একটু কষ্ট করে দু-পা হেঁটে গিয়ে ঘুড়িটা এখুনি তার থেকে খুলে এনে দেবেন। তাঁর কাছে ও তো এক মিনিটের মামলা, পা বাড়ালেই হল। আমিই ওদের কিনতে বাধা দিলাম। সেই পয়সায় ওদের চকোলেট কিনে দিয়েছি।

প্রমাণস্বরূপ, তাঁর নিজের শেয়ারের চকোলেট আমাকে দেখালেন ; দেখিয়েই মুখে পুরে দিলেন। তার পরে প্রসন্নমুখে বললেন, ও পাড়তে আপনার কতক্ষণ আর ! এক মিনিটের ব্যাপার। তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওদের।

এর আর কি জবাব দেব আমি ? বিকৃতবদনে চেয়ারে এসে বসি।

একটু পরেই অনতিপূর্বপরিচিত সেই দুই ভাগনে, তাদের তিন বোন, ভদ্রলোকের নিজস্ব সাত ছেলে মেয়ে এবং অপোগণ্ড-কোলে একজন ঝি—এই চৌদ্দজন, এক বিরাট শোভাযাত্রা করে এসে হাজির।

একাদিক্রমে সকলের দিকেই দৃক্‌পাত করি। এরা সবাই-ই কি ওই একমাত্র ঘুড়িটার প্রত্যাশী ? জিজ্ঞাসা করে জানলাম—তা-ই বটে। অনন্যোপায় হয়ে পকেট ঝেড়ে-ঝুড়ে খুচরা-খাচরা যা ছিল সব বার করতে হয়। প্রাণ এবং পয়সা এই দুয়ের মধ্যে টানাটানি বাধলে লোকে প্রথমত পয়সাই বার করে, প্রাণ সহজে বার করতে চায় না! পয়সা-বিয়োগ বরং সহ্য যায়, প্রাণ-বিয়োগের শোক একেবারেই অসহ্য।

—দেখ, ক'দিন থেকেই পায়ে ব্যথা যাচ্ছে তাই, নইলে ঘুড়িটা আমি তোমাদের পেড়ে দিতে পারলেই খুশী হতাম।

ওদের একটু হেঁটে দেখিয়ে দিই। জন্ম-খঞ্জের চেয়েও আমার পায়ের অবস্থা যে সম্প্রতি বেশী খারাপ, হাঁটার নমুনা দেখেই তা বুঝতে ওদের দেরি হয় না।

—দেখছ তো, এমনিতেই হাঁটতে কেমন খ্যাঁচ লাগছে। তার উপরে তারের উপর দিয়ে চলতে হলেই—বুঝতেই পারছ।

ওরা সমবেদনা প্রকাশ করে। সবাই বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন।

—তা তোমাদের আমি পয়সাই দিচ্ছি, ঘুড়ি তোমরা কিনে নাও গে, কেমন ?

দেখলাম কেউই এ প্রস্তাবে গররাজী নয়। পরের দুঃখ এরা বোঝে। প্রত্যেকের হাতেই চারটে করে পয়সা দিই।

অবশেষে ঝি-ও দেখি হাত বাড়ায়।

—য়্যাঁ ? তুমিও ওড়াও না কি ঘুড়ি ? আমি ঈষৎ অবাক হই, —বটে ? তোমারও ঐ বদ-অভ্যেস আছে ?

এক গাল হেসে মাথা নেড়েই ঝি তার জবাব দেয়, বাক্যব্যয়-বাহুল্য করে না।

অগত্যা ঝিকেও একটা আনি দিই। এবং ওর কোলের অপোগণ্ড-টাকেও দিতে হয়। কি জানি ওরও হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর সখ থাকতে পারে। কিছুই বলা যায় না। ওই বা কেন বাদ যাবে?

আমারই চৌদ্দটি আনির তেরটি আমারই চোখের সামনে অপরের ট্যাকস্থ হয়—আমি অম্লান বদনে সহ্য করি। কেবল শিশুটি তার আনিটা মুখস্থ করতে থাকে।

এর পর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে ভয় করে। পাড়ায় ছেলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব! কিন্তু ঘরে বসেও কি পরিত্রাণ আছে? একটি ছোট মাথা দরজার ফাঁকে উঁকি মারে।

উঁকি মারে, আবার অন্তর্হিত হয়। ডাক দিই।

অভ্যর্থনা পেয়ে কাছে আসে। খুব সম্ভব, আগের জন্মের আলাপী; কেননা ইহজন্মে একে কোথাও দেখেছি মনে হয় না।

সঙ্কোচে ছেলেটির মুখে কথা সরে না। একটা আনি দিই ওর হাতে—কিছু বলতে হবে না, এই নাও।

যেমন নীরবে এসেছিল তেমনি চলে যায়।

নাঃ, ঘরের মধ্যে থাকাও আর নিরাপদ নয়। ধড়াচূড়া পরে বেরিয়ে পড়তে হল।

বেরোবার মুখেই দুর্ঘটনা! একটি বালক তীরবেগে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। ভয়াবহ কলিশন, কিন্তু ফিরে আর তাকাই না; হত অথবা আহত, ফলাফল কি হল দেখবার দুঃসাহস হয় না। কেবল একটা আনি পেছনে ছেলেটার উদ্দেশে ছুড়ে দিই, দিয়েই দ্রুত অগ্রসর হই।

গলির মোড়ে আর একটি কিশোরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। হন হন করে সে চলেছে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। তাকে ধরে থামাতে হয়। —কোথায় যাচ্ছ বুঝতে পেরেছি। এই নাও। আনিটা ওর হাতে গুঁজে দিই।

ছেলেটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। —অনেক দূর থেকেই আসছ বলে বোধ হচ্ছে। বাড়িতে আমাকে না পেলে মনে কষ্ট পাবে, সেই-জন্যই দিলাম।

তবু যেন সে বুঝে উঠতে পারে না।

—আমার পায়ে ব্যথা কি না, তারে চড়তে পারব না তো, সেই-জন্যই! আমি ওকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করি।

ছেলেটি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই কিংকর্তব্য-বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে আমি সরে পড়ি।

অনেক ক্ষণ এধারে ওধারে কাটিয়ে বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরি। সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়, বালকের তো অভাব নেই পৃথিবীতে, বিশেষ করে যে-পার্থিব অংশটায় আমার বসবাস। একটা অপার্থিব ভীতি আমাকে বিচলিত করতে থাকে, পা টিপে টিপে পাড়া দিয়ে চলি। যে-রকম ছেলেপিলের সংক্রামকতা আজকাল!

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতেই কোলাহল এসে কানে লাগে। আর একটু এগোতেই সমস্ত বিশদ হয়। সামনের, পাশের, পেছনের অলিগলি এবং আমার বাড়ির আশপাশ জুড়ে কম-সে-কম প্রায় দেড় হাজার বালক! তারা একবার ঘুড়ির দিকে আর একবার আমার বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। কিসের এত আন্দোলন বুঝতে আর বাকি থাকে না।

'ন যযৌ ন তস্থৌ'—বুকনিটা বড় বড় পণ্ডিতদের লেখায় বারবার

চোখে পড়েছে, তোমরাও হয়তো চাক্ষুষ করে থাকবে, কিন্তু কথাটার যথার্থ মানে সেই মুহূর্তেই যেন প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলাম।

তারপর কেবল এই বাক্যগুলি অস্পষ্টভাবে আমার কানে এল : 'ঐ ঐ', 'ঐ যে তারেশ্বরবাবু!' 'তারেশ্বরবাবু এই দিকে—', 'আসুন আসুন, আমরা আপনার জন্যই—', 'ওঃ কখন থেকে দাঁড়িয়ে, বাপ্‌স!' 'কি হল ওঁর, ভদ্রলোক এগোচ্ছেন না তো!' 'গেঁটে বাত ধরল না কি!' 'ওদিক দিয়ে সরে পড়ছেন যে!' 'ও বাবা, তারশ্বেরবাবুর পেটে-পেটে এত!' 'কি সাংঘাতিক মানুষ দেখেছিস!' 'আরে পালায় যে!' 'তারশ্বেরবাবু পালাচ্ছেন!' 'পালাল রে, তারশ্বের পালাল!' 'সটকে পড়ল—ধর ধর তারশাকে!'

উপসংহারে এই কথাগুলো শুনলাম ঃ

'আপনি কখনো দৌড়ে পারেন আমাদের সঙ্গে?' 'রানিং-এর অভ্যেস থাকা চাই মশাই!' 'হ্যাঁ, আমাদের মতো প্র্যাকটিস করা চাই রেগুলার, রোজ সকালে উঠেই ছুটতে হবে মাঠে।' 'বলে রানিং-সু-ই কিনে ফেললাম ছ জোড়া।' 'কত গণ্ডা মেডেলই পেয়েছি প্রাইজ!' 'আমাদের সঙ্গে ছুটে পারবেন আপনি—ছোঃ!' 'আর এই দেহ নিয়ে?' 'দেহ না তো কলেবর!' 'তারের উপর দৌড়-ঝাঁপে কি হয় বলতে পারি না, তবে ফাঁকা রাস্তায় আপনি আমার সঙ্গে—হুঁ হুঁ, জানেন আমি রানিং-এ চ্যাম্পিয়ন?' 'ছি ছি, ছুটে পালাচ্ছেন, আপনার ভারি অন্যায়!' 'আপনি ভারি কাপুরুষ তারেশ্বরবাবু।'

তার পর যা হল, তা আর কহতব্য নয়। সম্মিলিত বাক্যতানের মধ্যেই কার্যকলাপ সব ঘটতে লাগল। মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড গোল দিতে পারলে যা হয় (প্রায়ই দিতে পারে না বা

নিজেদের গোলে দিয়ে ফেলে, তাই রক্ষে) সেই দুরবস্থাই আমার হল। ছেলেদের কাঁধে কাঁধেই ঘুড়ির নীচে বরাবর এসে পৌঁছলাম। আমার তখন কাঁদবার অবস্থা।

—কি চাও তোমরা বল তো ? অশ্রুপাত সংবরণ করে কোনো রকমে বাক্যস্ফূর্তি করি।

—ওই ঘুড়িটা আমরা চাই। তারের উপর দিয়ে গিয়ে ওটা আমাদের পেড়ে দিন।

—পায়ে ব্যথা যে, আমি অভিযোগ জানাই,—বাঁ পা-টায়।

—তাতে কি হয়েছে ? এক পায়ে কি যাওয়া যায় না ? এই রকম করে, একটা ছেলে অন্য পা তুলে একমাত্র পায়ে লাফিয়ে চলার কৌশলটা আমাকে দেখিয়ে দেয়।

তবু আমি বলবার চেষ্টা করি, তারের উপর কি অমন লাফানো চলবে ? কতটুকুই বা জায়গা ! অত স্কোপ কই ?

—খুব খুব, সকলের সমবেত উৎসাহ পাই—

—ও তার ছিঁড়বে না, ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে লাফান না !

—তবে তাই হোক। আমি 'মরিয়া' হয়ে উঠি। সেই হতভাগা জুতো জোড়াকে পাই কি না, খুঁজে দেখি।

বাড়ির মধ্যে ঢুকি। বেরোবার মুখেই বাধা পড়েছিল, তা না মেনে এই দুর্দশা এখন। পৃথিবী থেকেই আজ বেরিয়ে যেতে হবে কি না কে জানে ! আড়াই ডজন ছেলে আমার বডিগার্ড হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে আসে।

সেদিনই একটা দালালী করে একশ টাকা পেয়েছিলাম, নোটখানা বুকপকেটে কড়কড় করছিল। সেইটাই ভাঙিয়ে আনি-য়ে ফেলব না কি ? আনি-য়ে মানে আনি করে। মনে মনে ভাবি।

কিন্তু এই করেই কি নিস্তার আছে ? কাঁহাতক, কতদিন এমন পারা যাবে ? দুনিয়ার যাবতীয় আনি ফুরিয়ে গেলেও ছেলে ফুরাবে না। জীবাণুর চেয়েও ছেলেরা সংখ্যায় ও পরিমাণে বেশী। তবে ? তার চেয়ে বরং তারেই চেপে পড়া যাক। একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাওয়ার চেয়ে শুধু প্রাণে মারা যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

এঘর ওঘর খুঁজে, ভাঙা এক আলমারির পেছনে জুতো জোড়াকে আবিষ্কার করলাম। কালিঝুলি মেখে ভৌতিক চেহারা নিয়ে পড়ে আছে আমার সার্কাসের সহচরেরা, আমার এককালের পরম আত্মীয়!—দেখে দুঃখিত হলাম। বেচারাদের সারা গায়ে অগুন্তি আলপিন আর যত রাজ্যের পেরেক। আমার বাক্সের, দেরাজের আর ঘরের চাবি কেন যে কেবলই হারিয়ে যায়, এতদিনে তার কারণ প্রত্যক্ষ হল। সেই জুতোর গায়ে সংলগ্ন রয়েছে সব একত্র হয়ে ; মিলেমিশে বাস করছে সবাই। সুটকেসের একটা ছোট তালাও সেই সঙ্গে। একটা কর্ক-স্ক্রুও।

আমার আড়াই ডজন বডিগার্ডের এক-একজনের উপর এক-একটার ভার দিই। দশ জন আলপিনগুলো নিয়ে বাইরে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসে। চার জনে পেরেকগুলো সংগ্রহ করে। তিন জন মিলে অনেক ধস্তাধস্তিতে তালাটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাকি তের জন প্রত্যেকে একটা করে চাবি সজোরে ছিনিয়ে বহু কষ্টে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাখে ; কর্ক-স্ক্রুটাকেও।

তার পরে আমি সেই মারাত্মক জুতো পদতলগত করি। বিস্তর পয়সা ব্যয় করে তাল তাল চুম্বক লাগিয়ে 'স্পেশ্যাল'ভাবে ওদের তৈরি করানো হয়েছিল সার্কাসে ব্যবহারের জন্যই, যাতে তারে যাতায়াতের দুর্যোগে আকস্মিক পদস্খলন না ঘটে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে। এবং

কৃতজ্ঞতাসূত্রে একথা অবশ্যই স্বীকার করব, ওদের অনুগ্রহে তার থেকে কোনো দিন ভূপতিত হতে হয়নি আমাকে। হ্যাঁ, ভূপতিত হতে হয়নি, সত্যি।

কান-কাটানো করতালির মধ্যে তেতলার ছাদে গিয়ে দাঁড়াই। আবার যেন সার্কাসের দিন ফিরে আসে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি অগুন্তি কচি কচি উন্নত মুখ। উৎসুক এবং উদ্দীপ্ত। চারিধারে বালকের জনতার মধ্যে উৎসাহের আর অবধি নেই। এতক্ষণ হৃৎকম্প হচ্ছিল, কিন্তু ওদের উচ্ছ্বাস যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয় ক্রমশ—একটা বিজাতীয় আনন্দ বোধ হতে থাকে।

ভগবান মাথার উপরে এবং জুতো পায়ে—তখন আর ভয় কিসের? আকাশও মাথায় ভেঙে পড়বে না এবং ভূপতনের আশঙ্কাও নেই। অবলীলাক্রমে তারের উপর দিয়ে চলতে শুরু করি। সমস্ত তারটায় দু-দুবার টহল দেওয়া হয়ে যায়। একবার মনে হয়, প্রাতঃভ্রমণের এমন সোজা রাস্তা থাকতে এত দিন ব্যবহার করিনি কেন? এত উচ্চতায় আর এমন ফাঁকা জায়গায় অক্সিজেন নিশ্চয়ই যথেষ্টই থাকে, তবে রোজ সকালে উঠে এখানে পায়চারি করলেই তো হয়! নীচ থেকে হাত-তালির আর বিরাম নেই।

নীচ থেকে আওয়াজ পাই—ঘুড়ি ঘুড়ি! দেরি করছেন কেন? ধরে ফেলুন ঘুড়িটাকে।

হ্যাঁ, ঘুড়ি! প্রাতঃভ্রমণের ভাবনার মধ্যে ঘুড়ির কথা ভুললে চলবে না। ধরব তো বটেই।

কিন্তু আমি আছি তারের উপরে আর ঘুড়ি ঝুলছে তারের নীচে—কি করে ওটাকে বাগাই? উঁকি-ঝুঁকি মারি, অনেক চেষ্টাচরিত্র করি, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আর এক পা নীচে যতদূর সম্ভব নামিয়ে দিই; দিয়ে

ইতস্তত সঞ্চালন করি, কিন্তু ঘুড়ি থাকে তেমনি—আমার হাত-পা দুজনেরই নাগালের একেবারে বাইরে।

তাই তো, এ তো ভারি মুশকিল হল দেখছি!

—বসে পড়ুন মশাই। কিংবা শুয়েই পড়ুন না! তাহলেই ঠিক ধরতে পারবেন।

নীচে থেকে আদেশ-উপদেশের কামাই নেই, কিন্তু পালন করাই কঠিন। ভালো করেই ভেবে দেখি যে তারের উপর শুয়ে পড়া আমার পক্ষে তত সহজ হয়ে উঠবে না। না, বালিশের অভাবের জন্য বলছি না, এক ঘুমের পর বালিশ খুব কম রাত্রেই আমি খুঁজে পাই (আমার মাথার তলার চেয়ে চৌকির তলাই বালিশের বেশী পছন্দ)—সেজন্য না ; কিন্তু শয্যার সূক্ষ্মতাটাও তো বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত।

নীচ থেকে তাগাদার রেহাই হয় না, হাত-তালিও খুব জোর চলতে থাকে।

অকস্মাৎ আমি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি—যা থাকে কপালে, জয় মা দুর্গা, ঘুড়িটাকে আমি হাতাবই! তারের উপর হামাগুড়ি দিয়ে পড়ি। কিন্তু দুঃসাধ্য-সাধনার সূত্রপাতেই দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

তার থেকে আমার পা ফসকায়। ছেলেদের উত্তেজিত চীৎকারে আকাশ যেন অকস্মাৎ চৌচির হয়ে ফাটে, কিন্তু সমস্ত চেঁচামেচি ক্রমশ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে।

তার থেকে আমি পড়ে যাই। কিন্তু পড়ে যাবই বা কোথায়? যে চুম্বক লাগানো জুতো পায়ে, তাতে পড়া অত সহজ নয়। এতক্ষণ আমি ছিলাম তারের উপরে, এখন আমার উপরে থাকে তার—আমি ঝুলতে থাকি ঘুড়ির মতোই, ঘুড়ির পাশাপাশি। সেই সার্কাসের দুর্ঘটনাটার মতন—কি বিপদ ভাব দেখি!

নীচে মহা হৈ চৈ! ততক্ষণে ছেলেরা সব ভারি লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। তাদের উৎসাহ দেখে কে! আমার 'ঝোঝুল্যমান' অবস্থা—আমি নিরুপায়। ঘাড় বাঁকিয়ে আড় নয়নে কেবল তাকাই। সমবেত সকলের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করি—কি আর করব?

এতক্ষণ বাদে সকালের সেই মামা এগিয়ে আসেন—চকোলেট খাওয়া মামা। —আহা, কি করছ তোমরা! ভদ্রলোককে নামাবার ব্যবস্থা কর। শুধু লাফালে কি হবে?

মামা, তোমাকে ধন্যবাদ। মনে মনে সকৃতজ্ঞ হই।

—অমনি করে কি ঝুলে থাকা যায়? ভদ্রলোকের কষ্ট হচ্ছে না? ওইভাবে কতক্ষণ ওখানে থাকবেন?

—বলুন তো! বলুন মামা, আপনিই বলুন। এভাবে কতক্ষণ থাকা যায় শূন্যমার্গে?

মামা একটা দড়ি যোগাড় করে আনেন নিজেই। তাতে ফাঁস লাগিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দেন উপরে আমার দিকে। কয়েক বার ব্যর্থ চেষ্টার পর দড়ির ফাঁসটা আমার গলায় এসে বাধে।

মামা বলেন, বি রেডি—সব্বাই! এক হ্যাঁচকায় নাবিয়ে আনব। তোরা হাত পেতে তৈরী থাক—পড়লেই লুফে নিবি।

এইবার সত্যিই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়। —অমন কাজও করবেন না মামা। আমি প্রতিবাদ করার প্রচেষ্টা করি,—তাহলে ফাঁসি হয়ে যাবে যে! এখনো তো আপনাদের কাউকে খুন করিনি আমি!

মামা বলেন, তাহলে? তাহলে উপায়? তাহলে একটা মই নিয়ে আয়। হরেকেষ্টর বাড়ি আছে তেতলা-সমান মই, চেয়ে আন গে। মই ধরেই নেমে আসতে পারবেন তারেশ্বরবাবু।

—হ্যাঁ, তা হয়তো পারবেন। তারেশ্বরবাবু মনে মনে ঘাড় নাড়েন।

মই আসে।

আমার বরাবর খাটানো হয়।

মইয়ে হস্তক্ষেপ করি আমি।

পা আমার উপরের দিকে, মাধ্যাকর্ষণের চেয়েও মহত্তর আকর্ষণের কবলে—একান্ত অসহায়। কিন্তু হাত আছে, হাতই পায়ের অভাব পূরণ করবে এখন। লোকে যেমন পা চালিয়ে নামে, আমাকে তেমনি এখন 'স্টেপ বাই স্টেপ' হাত চালিয়ে নামতে হবে।

নামবার উদ্যোগ করছি, আবার ছেলেদের আর্তধ্বনি। —ঘুড়ি ঘুড়ি। ওটাকেও আনবেন ঐ সঙ্গে—

হ্যাঁ, ওকেও নিয়ে যাওয়া চাই। তা নইলে সেই একশ টাকার নোটখানাই হয়তো ঘুড়ির মতো উড়িয়ে দিতে হবে। আর, যার জন্য এত কাণ্ড, এত হাঙ্গামা, তাকেই কি ফেলে যাওয়া চলে?

ঘুড়িটাকে করতলগত করার জন্য হাত বাড়াই।

কিন্তু এমনি দুর্বিপাক—

এতক্ষণ ব্যাটা পাশেই ঝুলছিল অম্লান বদনে, কোনো উচ্চবাচ্য করেনি, কিন্তু এখন এই মুহূর্তেই কোত্থেকে দমকা বাতাস এসে পড়ল আর গেল সেটা নাগালের বাইরে চলে।

এখন সে উড়ছে তারের উপরে—ঠিক যেখানে একটু আগে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই জায়গায়।

আমি আছি শূন্যে, আর আমার শূন্যস্থান সে পূর্ণ করেছে।

বিবেকের বাহুল্য !

সকাল থেকেই মনটা খিঁচড়ে ছিল।

মুখ হাত ধুয়ে সবেমাত্র বারান্দায় বেরিয়েছি—প্রাতঃকালীন বায়ু সেবনের মতলবেই, এমন সময়ে নীচের রাস্তা থেকে আকস্মিক আর্তনাদ এক ভিখিরীর !

—দুদিন থেকে কিছু খাইনি বাবু !

ভিখিরী আর ভিখিরী ! সারা পৃথিবী যেন ভিখিরীতেই ছেয়ে গেছে। আর এই বাড়ির রাস্তা দিয়েই যত তাদের শোভাযাত্রা !

আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে আমার।

—যাও যাও ! কিছু হবে না। আমিও খেতে পাইনি চার দিন থেকে—তা জানো ?

চলে যায় বেচারা।

কিন্তু তার পর থেকেই আমার মনটা যেন আধমরা হয়ে আছে। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। ভিখিরীটাকে— ? যাকগে ! অত আর ভেবে পারা যায় না !

সকালের কাগজ আসে। খবরগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে যাই—

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শিশু-বৃদ্ধ-নির্বিচারে নিরীহ নরনারীর উপর বোমাবর্ষণ ! প্যালেস্টাইনকে দ্বিধাগ্রস্ত করার দুরভিসন্ধি ইংরেজের ! অ্যাবিসিনিয়ায় মুসোলিনীর মার-প্যাঁচ ! জু-দের উপর হিটলারী হুমকি ! চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধযাত্রা !



একেবারে পরিচিতের মতো এসে সে ঘরে ঢোকে। পৃষ্ঠা ১২২

এতক্ষণে মনের খচখচানি অনেকটা কমে আসে—স্বচ্ছন্দ বোধ করতে থাকি। খবরের কাগজ তুলে এবার স্বদেশের দিকে দৃষ্টি দিই—

না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করেছে পাঁচ জন, চাকরি না পেয়ে জন চারেক। একটা মেয়ে পুড়ে মরেছে, কেন কে জানে। কোন জমিদার কোথায় অত্যাচার করেছে প্রজাদের উপর। পুলিসের লাঠি চলেছে কোথায়! একটা ছেলে চাকরি খুইয়ে কোন আপিসের বড় সাহেবের কাছে দরবার করতে গেছল, দর বাড়াতে না পেরে নামঞ্জুর হয়ে সেই আপিসেরই চারতলা থেকে পড়ে মাথার খুলি চুরমার করেছে।—

ক্রমশ মনটা হালকা হতে থাকে।

আদালতের রিপোর্ট থেকে জানা গেল, কে না কি কংগ্রেসের কাজে সর্বস্বান্ত হয়ে, নিজের দেওয়ানী মকদ্দমার ব্রিফ দিতে গেছল কংগ্রেসের নেতা এক ব্যারিস্টারকে, তিনি বিনা-ফীসে ব্রিফ নিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সে মকদ্দমায় হেরে গিয়ে অপর পক্ষের উলটো চাপে পড়েছে। বেচারা এখন জেলে এই তৃতীয়বার, কিন্তু সিভিল ডিসওবীডিয়েন্সের ফলে নয় এবার। তারই অপর পৃষ্ঠায় সেই কংগ্রেসী নেতার অ্যালবার্ট হলের বক্তৃতার রিপোর্ট—লম্বা চওড়া, প্রায় তু কলম-ব্যাপী !

আনন্দের আতিশয্যে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে ফেলি !

বিনা বিচারে এবং বিনা প্রমাণে যাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে প্রায় বছর সাতেক ধরে—তাদের না কি অন্তত আরো সাত বছর থাকতে হবে ; আরো সাত বছর কি সত্তর বছর, তা অবশ্য এখনো স্থির হয়নি এবং এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। প্রধান মন্ত্রী

নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটদাতাদের যে-সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার কিছুই না কি একালে আর তিনি রাখছেন না—ইত্যাদি।

এতক্ষণে আমার উৎসাহ একেবারে চরমে ওঠে! পুলকের মাথায় বলেই ফেলি—আমার সব চেয়ে বড় শত্রুও যদি আসে আমার সামনে এখন, তাকেও আমি মার্জনা করে দেব। হ্যাঁ—এক্ষুণিই।

সেই মুহূর্তেই দরজা ঠেলে একজন ঢোকে আমার ঘরে। এক খর্বাকৃতি বামন—দেড় হাত তার উচ্চতা। পোশাক পরিচ্ছদ যদ্দূর নোঙরা হতে হয়। বয়েস আন্দাজ করার উপায় নেই—পঁচিশও হতে পারে, পঞ্চাশও; ঠিক করে কিছুই বলা যায় না। কেবল খর্ব হয়েই উনি ক্ষান্ত হননি—একাধারে বামন এবং অষ্টাবক্র। কোনো অঙ্গের সঙ্গে কোনো অঙ্গের মিল নেই—প্রত্যেক প্রত্যঙ্গই বিসদৃশ।

একেবারে পরিচিতের মতো এসে সে ঘরে ঢোকে। জুতোর বাক্সটাকে চেয়ার-করে বসে আমার সামনেই।

অবাক কাণ্ড! চিনি না তো একে! অথচ চেনা চেনা বোধ হচ্ছে যেন; খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে মনে হয়, হয়তো আয়নার মধ্যেই কখনো দেখে থাকব একে! আকার-প্রকার অনেকটা আমার সঙ্গেই খাপ খায়—অষ্টাবক্রতা বাদ দিলে হুবহু আমারই পকেট এডিশন! আমার প্যারডি যেন!

আমার জানা নেই, অথচ আমারই কোনো যমজ ভাই নয় তো? বহুকালের হারিয়ে-যাওয়া?

যমই হোক আর যমজই হোক, এমন অনাহূত আবির্ভাব আমি আদপেই পছন্দ করি না। রুক্ষ কণ্ঠেই বলি—কে বাপু তুমি? একটু আগেই একজনকে তাড়িয়েছি, আবার—

হ্যাঁ, জানি জানি, আর বলতে হবে না। আজ সকালেই এক ভিখিরীকে তুমি দরজা থেকে তাড়িয়েছ।

—তাড়িয়েছি বেশ করেছি, তোমার কি তাতে ?

—বেচারা খায়নি দুদিন থেকে !

—না খেয়ে আমার মাথা কিনেছে আর কি !

—আমার তাতে কিছু ক্ষতি হয়েছে বলেই বলছি। তোমার ব্যবহারে তোমার আর কি হয়, আমার গায়েই তো আঘাত লাগে। ভিখিরীকে দূর করে কি করেছ দেখ—এইখানটা কুঁচকে গেছে আমার। এইমাত্রই।

একটা প্রত্যঙ্গ সে প্রদর্শন করে। —চিরদিন আমি এমনি ছিলাম না—এমনি দুমড়ানো, ত্যাবড়ানো, অদ্ভুত, কুশ্রী, কদাকার। আমার বক্রতার খর্বতার জন্য তুমিই দায়ী।

আমি অবাক হয়ে যাই। বলে কি এ ?

অভিযোগের ফিরিস্তি শুনে যাই, বিস্ময়াভিভূত হয়েই শুনি, আমার ক্ষুদ্রকায় 'ক্যারিকেচার' আমারই মুখের উপর আমার কেচ্ছা একটার পর একটা উদ্গীর্ণ করে চলে।

ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমার আগাগোড়া ইতিহাস ! কবে একটা টিকটিকির (পুলিসের গোয়েন্দা নয় !) ল্যাজ ছিঁড়েছিলাম ; ইঁদুরের গলায় দড়ি বেঁধে সবেগে ঘুরিয়েছি ; কবে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলাম এক ক্লাশফ্রেণ্ডকে (ক্লাশফ্রেণ্ড কি ক্লাশ-ফো, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে এখন !) ; হাসপাতাল থেকে কবে এক কাঁচের পিচকিরি চুরি করেছি ; পরীক্ষার খাতার নম্বর পরীক্ষকের অজ্ঞাতসারে, সাত থেকে সাতাত্তরে পরিণত করেছি নিজের সৌজন্যে ;

কোন দিন কাকে ধাপ্পা দিয়েছি, ঠকিয়েছি, গালমন্দ করেছি—তারই এক সুদীর্ঘ তালিকা।

কতক্ষণ আর স্তম্ভিত হয়ে নিজের নিন্দায় কর্ণপাত করা যায়? আমি উসকে উঠি—ঢের হয়েছে! তুমি থাম। এসব নিয়ে আমি নিজেই কতদিন মাথা ঘামিয়েছি, ঘুম পায়নি কত রাত্রে, দুঃখ পেয়েছি কত দুঃসময়ে। নিজেই আমি জানি, তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না।

—তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়াই তো কাজ আমার!

—আমার মনের খবর তুমি জানলে কি করে হে?

—কেন, আমিই তো জানব!

—তুমিই জানবে! বটে! কে তুমি শুনি? সাক্ষাৎ পীর না কি!

—না।

—হলেও আমার কিছু আসত-যেত না; আমি মুসলমান নই। তবে কি তুমি? ভূত-প্রেত?

—উঁহু।

—গণৎকার টনৎকার?

—আমি তোমার বিবেক।

বিবেক! আমি চমকে উঠি।—যিশুখৃষ্ট মারা যাবার উনিশ শ সাঁইত্রিশ বছর পরে—এখনো ধরাতলে বিবেকের অস্তিত্ব রয়েছে না কি? হয়তো পড়ে থাকতে পারে এক টুকরো কাঁটার মতো বোকাসোকা কোনো মানুষের মনের কোণে-টোণে কোথাও, দেখা যায় কি যায় না, কখনো-সখনো অকারণে এক-আধটু খচ খচ করাই হল ওর কাজ; তা না, জলজ্যান্ত একেবারে কি না চোখের সামনে! কই বাপু, এতক্ষণ এই খবরের কাগজের এত ঘেঁটেও তো কোথাও

সন্ধান পাইনি তোমার—পৃথিবীর কোনো অংশ-প্রত্যংশেই ঘুণাক্ষরেও তোমার সংবাদ ছিল না !

আমার সমস্যাটাই সংক্ষেপ করে প্রশ্নরূপে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছি, সে বলে ওঠে—বুঝেছি কি বলতে চাও। আমি মারা যাইনি এখনো, যেতে পারিনে। আমাকে মেরে ফেলা সহজ নয় অত। তবে অদৃশ্য থাকাই আমার স্বভাব। তুমি এইমাত্র তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রুকে দেখতে চেয়েছিলে—তাই আমি তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছি।

—ও ! এতক্ষণে এই প্রাদুর্ভাবের রহস্য প্রাঞ্জল হয় আমার কাছে।

—এবং মার্জনা করতেও চেয়েছিলে। দেখছ তো, অনেক দিন থেকেই আমি অত্যন্ত মলিন হয়ে আছি। ময়লা জমেছে সর্বাঙ্গে। মার্জিত হওয়াও আমার দরকার।

—ময়লা জমেছে সে কি আমার দোষে ?

—নিশ্চয়ই ! এক একজনের বিবেক দেখবে কেমন ঝকঝক করছে। তাদের সাফ বিবেক—দিন রাত তারা পরিষ্কার রাখে।

—তোমাকে পরিষ্কার করার দায় পড়েছে আমার ! লোকের কাছে নিজের বিবেক বলে তোমার পরিচয় দিতে লজ্জা করে। কুঁজো, নুলো, খোঁড়া, কালো, বেঁটে, কদাকার তুমি !

—তার জন্য কে দায়ী ? তুমিই তো !

—আমি ! হতবাক্ হতে হয়। তোমার চেহারার মালিক আমি নই। আমি তোমায় তৈরি করিনি। খোদাকে দোষ দিতে পার।

—হ্যাঁ, তুমিই তো করেছ। যখন তুমি আট ন' বছরের তখন আমি ছিলাম পাঁচ হাত লম্বা—দেখতে ঠিক ছবির মতো। এখন এই দেড় হাতে আর এই বিটকেল চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছি।

—ছেলেবেলাতেই মারা যাওয়া উচিত ছিল তোমার! আমিও বাঁচতাম তাহলে।

—আমি মারা গেলে তোমাকে এত মনকষ্ট দেবে কে? আমি কষ্ট করেও বেঁচে থাকি—তোমার মনকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে।

—কৃতার্থ কর! বাধিত কর আমায়! বিরক্তি দমন করা শক্ত হয় আমার পক্ষে।

বলেই চলে সে—এক সময়ে তোমার বিবেক খুব প্রকাণ্ড ছিল এবং আমি খুব সুখী ছিলাম তোমাকে নিয়ে। কিন্তু ক্রমশই তুমি কেমন বদলে যেতে লাগলে—

—হয়েছে হয়েছে! আর শুনতে চাই না। আমি বাধা দিই। একটু আগেই একচোট আত্মজীবনী শুনেছি, আর না। আমার তরফের অভিযোগ আমি ব্যক্ত করি অবশেষে,—কিন্তু তোমারও এ কেমন ব্যবহার আমি জানতে চাই।

—কি রকম?

—সব সময় সব তাতেই তুমি আমাকে মনঃপীড়া দাও। তোমার কোনো প্রিন্সিপ্‌লই নেই। ধর, আমি ঐ ভিখিরীটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি—তার জন্যে সারা সকালটাই তুমি আমার মনটাকে তেতো করে রাখলে। কিন্তু আমি ভিখিরীকে খাইয়েও দেখেছি, তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও। দিন চার আগেই তো একজনকে আমি ভরপেট খাইয়েছি, অমনি তুমি বলে উঠেছিলে—না হে, এ ভালো করছ না! এইভাবে কুড়েমির প্রশ্রয় দিচ্ছ! অমনি পেলে আর কোনো দিন কি ও খেটে খাবে? ওর পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছ! তোমার প্ররোচনায় খাইয়েও মনে শান্তি পেলাম না।

—তারপর?

দম নেবার জন্য থামি।

বিবেক একটু মুচকি হাসে—বলে যাও, বলে যাও।

—তার পর পরশু দিন আরেকটা ভিখিরীকে আমি তাড়াইওনি, খাওয়াইওনি। স্পষ্টই বলে দিয়েছি যে আদর্শ নাগরিক হতে হলে, অমন করে থাকা চলবে না। তোমার আখেরে ক্ষতি হবে, এইজন্যই তোমাকে খেতে দেব না। তখন তোমার ব্যবহারটা কিরূপ হয়েছিল, শুনি? তুমি কি বলেছিলে আমায় মনে মনে? মনে পড়ে? বলেছিলে,—অমন স্পষ্ট করে, রূঢ় কথাটা না বললেই কি চলতো না? খাবার না পা'ক, ঢুটো মিষ্টি কথাই শুনে যেত না হয়। এবং এই নিয়ে ভেবে ভেবে সমস্ত দিন-ভোর কি কষ্টটাই না গেছে আমার! তার পর আজ—আজকের কথা আর বলতে চাই না!

মৃত্তু মধুর হাস্য করে আগন্তুক বলে—আমার স্বভাবই ওই। সব বিষয়ে, সব ব্যাপারে, সব সময়ে তোমাকে সজাগ রাখা। তোমাতে আর একটা গাধাতে এইখানেই তো তফাৎ। তোমার তবু একটুখানি বিবেক এখনো রয়ে গেছে, গাধার একেবারেই নেই—কোনো কালেই ছিল না।

—একটা গাধার বোঝার চেয়ে তুমি কিছু কম হালকা নও! আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি,—তোমার বোঝা বইতে আর রাজী নই আমি। তোমার ঢুর্ব্যবহারে অনেক দিন থেকেই আমি চটেছি। এতকাল ধরে, ঘা মেরে মেরে তোমাকে এখনো যে কেন এতটুকু একটা লাট্টুতে পরিণত করতে পারিনি, এই আমার আপসোস! ভদ্রসমাজে বসবাসের যোগ্য তুমি নও। তোমাকে একটা হোমিওপ্যাথিক পিল বানিয়ে কোনো গাধার পেটে পাঠাতে পারলেই তবে আমার শান্তি হত!

—আহা, চটছ কেন? অত ক্রোধ কিসের?

—এত দিন কি ক্ষতি করেছ আমার, জানো তুমি ? তোমার জন্যই আমি কিছু হতে পারিনি, কিছু করে উঠতে পারলাম না। সব তাতেই তোমার বাধা। কেবলই বাধা। সব সময়েই। এগোতেও বাধা, পেছোতেও বাধা ! এবার আমায় রেহাই দাও।

—উঁ হুহুঁ। বিবেক আবার ঘাড় নাড়ে।

—তুমি যদি এখনো আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহলে এখনই আমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় ! যাদের তুমি ছোটবেলাতেই ছেড়ে গেছ, তারাই আজ দশজনের মধ্যে একজন—ভাগ্যবান, ধনবান, কীর্তিমান। তারাই খোলার বাড়ি থেকে গোলাবাড়ি করেছে। ফুটপাথ থেকে মন্ত্রীর মসনদে গিয়ে বসেছে ! তুমি তাল থেকে তিলে না দাঁড়ালে কারো তিল থেকে তালে পরিণত হবার আশা নেই। তুমিই মানুষের অবনতির মূল, তুমি থাকতে উন্নতি নেই কারো। তোমারও তো বিবেক আছে—তুমি নিজেই তো বিবেক, বল না ঠিক কথা বলছি কি না !

—কি জানি ! হয়তো ঠিক বলছ, হয়তো ঠিক বলছ না ! দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে সে দৃক্‌পাত করে।

—তাহলে দয়া কর ! চলে যাও আমার কাছ থেকে। দূর হয়ে যাও। আজ সকালের সেই ভিখিরীর মতো। চিরদিনের জন্য চলে যাও, কখনো আর কোনো অজুহাতেই ফিরে এসো না। তোমাকে আমার দরকার নেই। এখনো তো সবে আমি কলেজের ছাত্র, অনন্ত সম্ভাবনা আমার সম্মুখে, কত কি-ই না হতে পারি আমি। নাম-করা উকিল হতে পারি, ডাক্তার হতে পারি, আদালতের সেরা ব্যারিস্টার হতে পারি। অন্তত একটা অপরাজেয় কথাশিল্পী হওয়াও অসম্ভব না হতে পারে আমার পক্ষে। আজকের খবরের কাগজ থেকে বিস্তর আশ্বাস আমি পেয়েছি। হয়তো আমার কোনো ডিকটেটার হওয়াও

সম্ভব। আর কিছু না হতে পারি, নিদেন প্রধান মন্ত্রী তো হতে পারব ? কিন্তু কিছুই আমি হতে পারব না, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে না যাও!

দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে দাঁড়ি টানি ; বেদম হয়ে থামতে হয়। বিবেক কেবল মাথা নাড়ে—উঁহুহুঁ। তোমাকে ছেড়ে থাকা কি পোষায় আমার ? ঠোঁট বাঁকিয়ে সে বলে—আমার উপর যতই অত্যাচার কর আর অনাচার কর, তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমি যে তোমারই।

তারপরেই দারুণ দীর্ঘনিশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গেই এক হৃদয়ভেদী কটাক্ষ !

—তবে রে— বলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি জুতোর বাক্সের উপর, দু হাতের মুঠোয় ওর গলা টিপে ধরি—এইখানেই শেষ। আজ, হত্যাই করব তোমায় !

ও কামড়ে দেয় আমার হাতে। —উঃ! চেঁচিয়ে উঠি আমি। উচ্ছ্বসিত বীররস বিগলিত করুণ রস হয়ে আসে।

সেই ফাঁকেই সে হাত ছাড়িয়ে একেবারে দরজার কাছে। দেহকে বহিষ্কৃত করে শুধু মুখ বাড়িয়ে বলে—তুমি বড় সুবিধের নও তো হে! এবার থেকে অদৃশ্য হয়েই থাকতে হবে দেখছি।

—তাহলে তুমি আর আমায় নিষ্কৃতি দিলে না! ডিকটেটার কি কথাশিল্পী হওয়া স্বপ্নই থেকে গেল তবে আমার! নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই কাহিল শোনায় নিতান্ত।

—যতদিন আমার কামড়ের জ্বালা টের পাবে ততদিন তো না! এই বলে বিবেক অন্তর্হিত হয়।

প্রধান মন্ত্রী ইত্যাদি হওয়া আর সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। তখন থেকে বিবেকের দংশন-জ্বালাই অনুভব করছি—দিনরাত।

পরোপকারের বিপদ

আমার বন্ধু নিরঞ্জন ছোটবেলা থেকেই বিশ্বহিতৈষী—ইংরেজীতে যাকে বলে ফিলানথ্রপিস্ট। একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তে ওর ফিলানথ্রপিজমের অনেক ধাক্কা আমাদের সইতে হয়েছে। নানা সুযোগে ও দুর্যোগে ও আমাদের হিত করবেই, একেবারে বদ্ধপরিকর—আমরাও কিছুতেই দেব না ওকে হিত করতে। অবশেষে অনেক ধস্তাধস্তি করে, অনেক কষ্টে হয়তো ওর হিতৈষিতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি।

হয়তো ফুটবল ম্যাচ জিতেছি, সামনে এক ঝুড়ি লেমোনেড, দারুণ তেষ্টাও এদিকে ; ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে, বলেছে—এত পরিশ্রমের পর জল খেলে হার্টফেল করবে।

আমরা বলেছি—করে করুক, তোমার তাতে কি ?

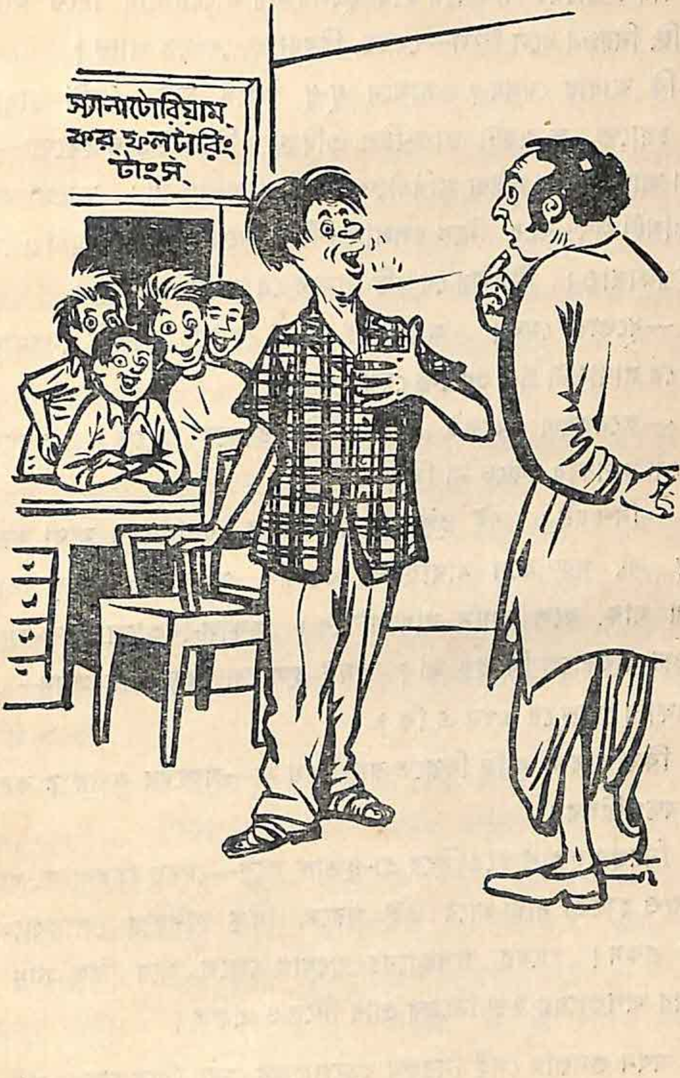
—আহা, মারা যাবে যে।

—জল না খেলেও যে মারা যাব, দেখছ না।

সে গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছে—সেও ভালো।

তখন ইচ্ছে হয়েছে আরেকবার ম্যাচ খেলা শুরু করি—নিরঞ্জনকেই ফুটবল বানিয়ে। কিংবা ওকে ক্রিকেটের বল ভেবে নিয়ে লেমোনেডের বোতলগুলোকে ব্যাটের মতো ব্যবহার করা যাক।

পরের উপকার করবার বাতিকে নিজের উপকার করার সময় পেত না ও। নিজের উপকারের দিকটা দেখতেই পেত না বুঝি।



…নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল—…খ-খবর ভালো? পৃষ্ঠা ১৩৭

এক দারুণ গ্রীষ্মের শনিবারে হাফ-স্কুলের পর মাঠের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরছি, নিরঞ্জন বলে উঠল—দেখছ, হিরণ্যাক্ষ, দেখতে পাচ্ছ ?

কি আবার দেখব ? সামনে ধূ ধূ করছে মাঠ, একটা রাখাল গরু চরাচ্ছে, দু-একটা কাক-চিল এদিক ওদিকে উড়ছে হয়তো—এ ছাড়া আর কোনো দ্রষ্টব্য পৃথিবীতে দেখতে পেলাম না। ভালো করে আকাশটা লক্ষ্য করে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ, দেখেছি, এক ফোঁটাও মেঘ নেই কোথাও। শীগগীর যে বৃষ্টি নামবে সে ভরসা করি না।

—ধুত্তোর মেঘ! আমি কি মেঘ দেখতে বলেছি তোমায়। ওই যে রাখালটা গরু চরাচ্ছে দেখছ না ?

—অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি, কি হয়েছে তাতে ? গরুদের কোনো অপকার করছে না কি ?

—নিশ্চয়ই! এই দুপুর রোদে ঘুরলে বেচারাদের মাথা ধরবে না ? না, গরু বলে মাথাই নয় ওদের! মানুষ নয় ওরা ? বাড়ি নিয়ে যাক, বলে আসি রাখালটাকে। সকাল-বিকালে এক-আধটু হাওয়া খাওয়ালে কি হয় না ? সেই হল গে বেড়ানোর সময়—এই কাঠফাটা রোদ্দুরে এখন এ কি ?

কিন্তু রাখাল বাড়ি ফিরতে রাজী হয় না—গরুদের অপকার করতে সে বদ্ধপরিকর।

নিরঞ্জন হতাশ হয়ে ফিরে হা-হুতাশ করে—দেখছ হিরণ্যাক্ষ, ব্যাটা নিজেও হয়তো মারা যাবে এই গরমে, কিন্তু দুনিয়ার লোকগুলোই এই রকম! পরের অপকারের সুযোগ পেলে আর কিছু চায় না, পরের অপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!

যখন শুনলাম সেই নিরঞ্জন বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যাচ্ছে, তখন আমি রীতিমতো

অবাক হয়ে গেলাম। যাক, এতদিনে তাহলে ও নিজেকে পর বিবেচনা করতে পেরেছে, তা না হলে নিজেকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে? নিজেকে পর না ভাবতে পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা কি নিরঞ্জনের পক্ষে সম্ভব?

অকস্মাৎ একদিন নিরঞ্জন আমার বাড়ি এসে হাজির। বোধ হয় বিলেত যাবার আগে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতেই বেরিয়েছিল। অভিমানভরে বললাম—চুপি-চাপি বিয়েটা সারলে হে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের? জানি, আমাদের ভালোর জন্যই খবর দাওনি, অনেক কিছু ভালোমন্দ খেয়ে পাছে কলেরা ধরে সেই কারণেই কাউকে জানাওনি,—কিন্তু না হয় নাই খেতাম আমরা, কেবল বিয়েটাই দেখতাম। বউ দেখলে কানা হয়ে যেতাম না তো!

—কি যে বল তুমি! বিয়েই হল না তো বিয়ের নেমন্তন্ন! নিজের উপকার করব তুমি তাই ভেবেছ আমাকে? পাগল! ভাবছি, তোতলাদের জন্য একটা ইস্কুল খুলব। মূক-বধিরদের বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোতলাদের নেই। অথচ কি 'পসিবিলিটি'ই না আছে তোতলাদের!

—কি রকম?—আমি অবাক হবার চেষ্টা করি।

—জানো? প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস আসলে কি ছিলেন? একজন তোতলামাত্র। মুখে মার্বেলের গুলি রাখার প্র্যাকটিস করে করে তোতলামি সারিয়ে ফেললেন। অবশেষে, এত বড় বক্তা হলেন যে, অমন বক্তা পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি। সেটা মার্বেলের গুলির কল্যাণে কিংবা তোতলা ছিলেন বলেই হল, তা অবশ্য বলতে পারি না।

—বোধ হয় ওই দুটোর জন্যই—আমি যোগ দিলাম।

নিরঞ্জন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল—আমার তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলা দেশের তোতলাদের সব ডিমস্থিনিস তৈরি করব। তোতলা তো তারা আছেই, এখন দরকার শুধু মার্বেলের গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস হবার আর বাকি কি রইল ?

আমি সভয়ে বললাম, কিন্তু ডিমস্থিনিসের কি খুব প্রয়োজন আছে এ দেশে ?

সে যেন জ্বলে উঠল—নেই আবার! বক্তার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি, লোককে কাজে প্রেরণা দিতে বক্তা চাই আগে। শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হলে এই ঘুমন্ত দেশ আর জাগে না। কেন, বক্তৃতা ভালো লাগে না তোমার ?

—থামলে ভারি ভালো লেগে যায় হঠাৎ, কিন্তু যখন চলতে থাকে, তখন মনে হয় কালারাই পৃথিবীতে সুখী।

আমার কথায় কান না দিয়ে নিরঞ্জন বলে চলল—তাহলেই দেখ, দেশের জন্য চাই বক্তা, আর বক্তার জন্য চাই তোতলা। কেননা ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোতলাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব, যেহেতু ডিমস্থিনিস নিজে তোতলা ছিলেন। অতএব ভেবে দেখ, তোতলারাই হল আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।

যেমন করে ও আমার আস্তিন চেপে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে জামা বাঁচাতে আমাকে সায় দিতে হল।

—তোতলাদের একটা ইস্কুল খুলব, সবই ঠিক, বিস্তর তোতলাকে রাজীও করেছি, কেবল একটা পছন্দসই নামের অভাবে ইস্কুলটা খুলতে পারছি না। একটা নামকরণ করে দাও না তুমি! সেইজন্যই এলাম।

—কেন, নাম তো পড়েই আছে, 'নিঃস্বভারতী'—চমৎকার! ভারতী মানে বাক্য, যাদের নিঃস্ব, কি না থেকেও নেই, তারাই হল গিয়ে নিঃস্বভারতী।

—উঁহু, ও নাম দেওয়া চলবে না। কারণ রবিঠাকুর ভাববেন, বিশ্বভারতী থেকেই নামটা চুরি করেছি।

—তবে একটা ইংরেজী নাম দাও—Sanatorium for Faltering Tongues (সানাটোরিয়াম ফর ফলটারিং টাংস)—বেশ হবে।

—কিন্তু বড় লম্বা হল হে।

—তা তো হলই। যেদিন দেখবে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা সটান উচ্চারণ করতে পারছে, কোথাও আটকাচ্ছে না, সেদিনই বুঝবে তারা পাস হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম ঠুকে বিদায় নিতে পারে। নাম-কে নাম, কোশ্চেন পেপার-কে কোশ্চেন পেপার।

—হাঁ, ঠিক বলেছ। এই নামটাই থাকল।—বলে নিরঞ্জন আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে সবেগে বেরিয়ে পড়ল, সম্ভবত সেই মুহূর্তেই তার ইস্কুল খোলার সুমতলবে।

মহা সমারোহে এবং মহা সোরগোল করে নিরঞ্জনের ইস্কুল চলছে। অনেক দিন এবং অনেক ধার থেকেই খবরটা কানে আসছিল। মাঝে মাঝে অদম্য ইচ্ছেও হত, একবার দেখে আসি ওর ইস্কুলটা, কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না মোটেই। অবশেষে গত গুডফ্রাইডের ছুটিটা সামনে পেতেই ভাবলাম—নাঃ, এবার দেখতেই হবে ওর ইস্কুলটা। এ সুযোগ আর হাতছাড়া নয়। নিরঞ্জন ওদিকে দেশের এবং দশের উপকার করে মরছে, আর আমি ওর কাছে গিয়ে ওকে একটু উৎসাহ দেব, এইটুকু সময়ও হবে না আমার! ধিক্ আমাকে!

মার্বেলের গুলির কল্যাণে, নিশ্চয়ই অনেকের তোতলামি সেরেছে এতদিন। তাছাড়া আনুসঙ্গিকভাবে আরো অনেক উপকার—যেমন দাঁত শক্ত, মুখের হাঁ বড়, ক্ষুধাবৃদ্ধি—এ সবও হয়েছে। এবং ডিমস্থিনিস হবার পথেও অনেকটা এগিয়েছে ছাত্ররা। অন্তত 'ডিম' পর্যন্ত তো এগিয়েছেই, এবং যে রকম কষে' তা দিচ্ছে নিরঞ্জন, তাতে 'স্থিনিসের'ও বেশী দেরি নেই—হয়ে এল বলে।

ঠিকানার কাছাকাছি পৌঁছতেই বিপর্যয় রকমের কলরব কানে এসে আঘাত করল, সেই কোলাহল অনুসরণ করে সানাটোরিয়াম ফর ফলটারিং টাংস খুঁজে বের করা কঠিন হল না। বিচিত্র স্বরসাধনার দ্বারা ইস্কুলটা প্রতি মুহূর্তেই যেন প্রমাণ করতে উদ্যত যে, ওটা মূক-বধিরদের বিদ্যালয় নয়। কিন্তু আমার মনে হল, তা-ই হলেই ভালো ছিল বরং, ওদের কণ্ঠলাঘব এবং আমাদের কানের আত্মরক্ষার পক্ষে।

আমাকে দেখেই কয়েকটি ছেলে ছুটে এল—কা-কা-কা-কা-কা-কে চান?

দ্বিতীয়টি তাকে বাধা দিয়ে বলতে গেল—মা-মা-মা-মা-মা— কিন্তু মা-মার বেশী আর কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

তখন প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয়ের বাক্যকে সম্পূর্ণ করল—মাস্টার বা-বা-বা-বা—

আমি বললাম, কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কাউকে আমি চাই না! নিরঞ্জন আছে?

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল? সে কি, নিরঞ্জনকে এরা চেনে না? এদের প্রতিষ্ঠাতা নিরঞ্জন, তাকেই চেনে না! কিংবা যার নাম উচ্চারণ-সীমার বাইরে, তাকে না চেনাই এরা নিরাপদ মনে করেছে।

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ঐখান দিয়ে, মনে হল এই ইস্কুলের ক্লার্ক, তাঁকে ডেকে নিরঞ্জনের খবর জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—ও, মাস্টার বাবু? এই পর্যন্ত তিনি বললেন, বাকিটা হাতের ইশারা দিয়ে জানালেন যে তিনি উপরে আছেন। এই ভদ্রলোকও তোতলা না কি?

আমাকে দেখেই নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল—এই যে অ-অনেক দিন পরে! খ-খবর ভালো?

য়্যাঁ? নিরঞ্জনও তোতলা হয়ে গেল না কি? না, ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে? বললাম, তা মন্দ কি! কিন্তু তোমার খবর তো ভালো মনে হচ্ছে না? তোতলামি প্র্যাকটিস করছ কবে থেকে?

—পা-পা-পরাক—প্র্যাকটিস করব কে-কেন? তো-তো-তোতলামি আবার কে-কেউ প্র্যাকটিস করে!

—তবে তোতলামিতে প্রোমোশন পেয়েছ বল!

ভাই হি-হি-হিরণ্ণা-ণ্ণা-ণ্ণা-ণ্ণা-ণ্ণা-ণ্ণা—বলতে বলতে নিরঞ্জনের দম আটকে যাবার যোগাড় হল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম—হিরণ্যাক্ষ বলতে যদি তোমার কষ্ট হয়, না হয় তুমি আমাকে হিরণ্যকশিপুই বল। 'কশিপু'র মধ্যে 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বলল—ভাই হিরণ্যকশিপু, আমার এই সানাটো-টো-টো-টো-টো—

এবার ওর চোখ কপালে উঠল দেখে আমি ভয় খেয়ে গেলাম। ইস্কুলের লম্বা নামটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার অভিপ্রায়ে বললাম—হ্যাঁ, বুঝেছি, তোমার এই সানাটোজেন, তারপর?

নিরঞ্জন রীতিমতো চটে গেল—সানাটোজেন? আমার ইস্কুল

হো-হো-হোলো গিয়ে সা-সানাটোজেন ? সানাটোজেন তো এ-একটা ও-ও-ওষুধ !

—আহা ধরেই নাও না কেন ! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ ! তোতলামি সারানোর এটা ওষুধ নয় কি ?

অতঃপর নিরঞ্জন খুশী হয়ে একটু হাসল। ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তা, তোমার ছাত্ররা কদ্দূর ডিমস্থিনিস হল ?

—ডি-ডিম হল !

—অর্ধেক যখন হয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি ! আমি ওকে উৎসাহ দিলাম।

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে—আ-আর হবে না ! মা-মা-মার্বেলই মুখে রাখতে পা-পারে না তো কি-কি-কি করে হবে ?

—মুখে রাখতে পারে না ? কেন ?

—স-স-সব গি-গিলে ফেলে !

—গিলে ফেলে ? তাহলে আর তোতলামি সারবে কি করে, সত্যিই তো ! তা, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল, বুঝলে ? রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়া দরকার, দেরি করা ভালো না।

হতাশভাবে মাথা নেড়ে নিরঞ্জন জবাব দেয়—আ-আমার যে ডি-ডি-ডি-ডিসপেপসিয়া আছে ? হ-হ-হজম করতে পা-পারব কেন ?

—ও, ডিসপেপসিয়া থাকলে তোতলামি সারে না বুঝি ?

—তা-তা কেন ? আ-আমিও গি-গিলে ফেলি ! আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নিরঞ্জন বলল—আ-আমার কি আর পা-পা-পাথর হ-হজম করার ব-ব-বয়স আছে ?

—তাই তো ! ভারি মুশকিল তো ! তোমার চলছে কি করে ? ছেলেরা বেতন দেয় তো নিয়মমতো ?

—উঁহু, স-ব ফি-ফি-ফ্রি যে! অ-অনেক সা-সাধাসাধি করে আনতে হয়েছে!

—তবে তোমার চলছে কি করে?

—কে-কেন? মা-মা-মার্বেল বেচে? এক-একজন দ-দ-দশটা বারোটা করে খায় রোজ। ওগুলো মু-মু-মুখে রাখা ভা-ভা-ভা-ভারি শক্ত।

—বটে? বিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমি হতবাক্ হয়ে রইলাম, তার পরে আমার মুখ দিয়ে কেবল বেরোল—ব-ব-বল কি!

যেমনি না নিজের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়া, অমনি আমার আত্মা-পুরুষ চমকে উঠল। য়্যা, আমিও তোতলা হয়ে গেলাম না কি! নাঃ, আর এক মুহূর্তও এই মারাত্মক জায়গায় না! তিন লাফে সিঁড়ি টপকে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে পড়লাম সদর রাস্তায়!